মধ্য যুগের কথা





পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক নতুন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী সপ্তম শ্রেণীর জন্য লিখিত এবং পর্ষদ্ কর্তৃক অনুমোদিত।

Vide Notification No. TB/VII/H/81/81 dated 8. 1. 1.

মধ্যযুগের কথা

[সপ্তম শ্রেণীর জন্য]

শ্রীকুলদাপ্রসাদ চৌধুরী, এম এ. (ইতিহাস), এম. এ (এডুকেশন) এ বি. সি. এস. (লণ্ডন)।
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান ও ডীন অফ্ দি ফ্যাকাল্টি অফ এডুকেশন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

শান্তি লাইব্রেরী
১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

MADHYA YUGER KATHA

(*Intended for class VII*)

Written by

KULADAPRASAD CHOWDHURY,

M. A. (History) M. A. (Education)

A. B. C. S. (London)

প্রকাশক :
শ্রীপ্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

মূল্য : ১০·৩৮

অলংকরণে :
শ্রীপ্রভাত কর্মকার

মুদ্রাকর :
শ্রীসুভাষচন্দ্র রায়
বিধান প্রেস
৪৫/১ এফ, বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

ইতিহাস পড়ান যাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয় তার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছি। পাঠ্যপুস্তক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে লিখিত না হলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পড়ান অসম্ভব। তবু, বইখানাতে যে সব বৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি :

১। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে যে সব নাম বা ঘটনাবলী গুরুত্বপূর্ণ তাদের ছাড়া অতিরিক্ত নাম বা ঘটনার বোঝা ছাত্রদের ঘাড়ে চাপিয়ে তাদের স্মৃতিশক্তিকে ভারাক্রান্ত করতে চেষ্টা করা হয়নি।

২। বই-এ দেওয়া ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যাতে ছাত্রেরা না বুঝে মুখস্থ না করে তার জন্য (তাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের স্তর বিবেচনা করে) তাদের অন্তর্নিহিত কার্য-কারণ সম্বন্ধ যথাযথ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৩। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া সাল, তারিখ ইত্যাদি দিয়ে ছাত্রদের মুখস্থ করার প্রবৃত্তি বাড়ানো হয়নি। সাধারণতঃ শতাব্দী বা অর্ধশতাব্দীর উল্লেখ করে সময় সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া প্রতিক্ষেত্রে, বর্তমান থেকে ঘটনাটি কত আগে ঘটেছিল সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

৪। আমাদের ছাত্রদের "ম্যাপ পড়া" শেখান হয় না। তাই ম্যাপ পাঠ্য বই-এ দিলেও তা' তাদের কাছে অর্থহীনই থাকে। তাই ম্যাপের বিষয়বস্তু বই-এ সন্নিবেশিত করে তাদের সাহায্যে ছাত্রদের ম্যাপ দেখতে শেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

৫। "অনুশীলনী" যে কেবলমাত্র জ্ঞান-পরীক্ষার মাধ্যম নয় জ্ঞানলাভেরও মাধ্যম, এই বিশ্বাস নিয়ে পাঠের শেষের প্রশ্নগুলি রচনা করা হয়েছে। শিক্ষক মহাশয়দের কাজে লাগবে এই আশায় তাতে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন রচনা কৌশলের (রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক ও নৈর্ব্যক্তিক) দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে।

৬। শিক্ষক মহাশয়দের কাজে লাগবে এই আশায় কিছু কিছু নতুন ধরণের প্রদীপনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বইটি ভাল লাগলে পরিশ্রম সার্থক মনে হবে। আমার বহু ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে ব্রতী আছেন। আশা করি তাঁরা এই পুস্তকটিকে সমাদরে গ্রহণ করবেন। বইটির সমালোচনা সাদরে গৃহীত হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে বইটিরও পরিমার্জন সম্ভব হবে।

বিনীত
গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম পাঠ

'মধ্যযুগ' কথার অর্থ

সভ্যতার ইতিহাসের প্রকৃতি : হাজার হাজার বছর আগে মানুষের সভ্যতা শুরু হয়েছে। আজও তা এগিয়ে চলেছে। এই সভ্যতার ইতিহাস পড়লে তোমরা দেখবে উঠা-নামাই এর প্রকৃতি। আজ যে জাতি সভ্যতার খুব উঁচুতে উঠেছে, কাল হয়ত দেখবে সে পেছিয়ে পড়েছে। আমাদের কথাই ধর না কেন! একদিন আমরা সভ্যতায় পৃথিবীর সকল দেশের সেরা ছিলাম। আজ কিন্তু পশ্চিমের দেশগুলির তুলনায় আমরা বিজ্ঞান ও যন্ত্র দিয়ে জিনিষপত্র তৈরীর ক্ষেত্রে পেছিয়ে পড়েছি। গ্রীক ও রোমানদের উন্নত সভ্যতার কথা তোমরা পড়েছ। কিন্তু আজ তারা ইউরোপের অনেক জাতি থেকে সভ্যতায় পেছিয়ে আছে। কোন্ জাতি সভ্যতায় এগিয়ে গেল বা কে পেছিয়ে পড়ল তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা মানুষের সভ্যতা তার নিজস্ব গতিতে সর্বদা এগিয়ে চলেছে।

আমরা সভ্যতায় পেছিয়ে পড়েছি, কিন্তু ইউরোপের দেশগুলি সভ্যতায় এগিয়ে গেছে। আবার দেখছি ইউরোপের দেশগুলিকে পেছনে ফেলে নতুন দেশ আমেরিকা সভ্যতায় এগিয়ে চলেছে।

মানুষের সভ্যতার আর এক প্রকৃতি, যুগে যুগে তার উঠা-নামা আছে। প্রাচীন যুগে সভ্যতা কত উঁচুতে উঠেছিল তোমরা তা' পড়েছ। তারপর এল আর এক যুগ। তখন মনে হল সভ্যতার গতি যেন থেমে গেছে—আর যেন তেমনভাবে এগিয়ে চলতে পারছে না। কিন্তু তার পরেই বর্তমান যুগে, সভ্যতা আবার দ্রুত লয়ে এগিয়ে চলছে। সভ্যতার স্রোতে মানুষের এগিয়ে যাওয়া কোন কালে রুদ্ধ হয়নি, হবেও না।

সভ্যতার তিন যুগ : এখন পর্যন্ত মানুষের সভ্যতার ইতিহাসকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে প্রাচীর যুগের সভ্যতার ইতিহাস তোমরা পড়েছ। আর আধুনিক যুগের সভ্যতার মধ্যে

তোমরা আমরা সকলে বাস করছি। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মাঝখানে যে যুগ রয়েছে তাকে বলে সভ্যতার মধ্যযুগ। নীচে নীচের



অজন্তার গুহাচিত্র খ্রীষ্টান মঠ কাপড়ের কল

ছবি দেখ। প্রতি যুগের প্রতীক হিসেবে যে ছবি দেওয়া রয়েছে তা কেন দেওয়া হল একবার ভেবে দেখ।

মধ্যযুগের সভ্যতা বলতে আমরা কি বুঝি? আগেই আলোচনা করেছি যে প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের মাঝখানে রয়েছে বলে এই যুগের সভ্যতাকে মধ্যযুগের সভ্যতা বলা হয়। আর একটা কথা, প্রাচীন যুগে মানুষের সভ্যতা খুব উঁচু স্তরে পৌঁছেছিল; আধুনিক যুগেও সভ্যতা খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছে। মধ্যযুগের সভ্যতা কিন্তু প্রাচীন ও আধুনিক যুগের তুলনায় অত উঁচু স্তরে উঠতে পারেনি।

তোমরা পরের পাঠেই পড়বে যে যখন অসভ্য জাতিরা যুদ্ধ করে প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংস করে দেয় তখন থেকে সুরু হয় মধ্য যুগ। কিন্তু এই অসভ্য জাতিরা ধীরে ধীরে নিজেদের অজান্তে প্রাচীন সভ্যতা গ্রহণ করে নেয়। প্রাচীন সভ্যতাকে গ্রহণ করে তারা একে আরও এগিয়ে নিয়ে চলে—সুরু হয় বর্তমান যুগ। অসভ্য জাতিদের প্রাচীন সভ্যতা গ্রহণ করতে যতদিন সময় লেগেছিল, তাকেই বলা হয় মধ্য যুগ। সভ্যতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে চলার জন্য এই সময়টাকে মানুষের প্রস্তুতির যুগও বলা চলে।

অসভ্য জাতিদের প্রাচীন সভ্যতা ভাল করে গ্রহণ করতে সময় লাগে প্রায় দশ হাজার বছর। এই দশ হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসকে (মোটামুটিভাবে পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ থেকে পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) আমরা মধ্যযুগের ইতিহাস বলি। আরও একটু ভাল করে বুঝে দেখি। মধ্যযুগ হল সেই যুগ, ১। যে যুগ প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মাঝখানে রয়েছে ২। যে যুগে সভ্যতা তেমন উঁচু মানের নয়। মানুষ তখন

সভ্যতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ৩। যে যুগের সময় কাল মোটামুটিভাবে দশ হাজার বছর—পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ থেকে পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

উত্তর করে শেখো

১। 'মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে ওঠা-পড়া রয়েছে' কথাটা একটু বুঝিয়ে বল।

২। মানুষের সভ্যতার তিন যুগের নাম কর এবং প্রতি যুগের একটি করে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ কর।

৩। মধ্যযুগ বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় পাঠ

ইউরোপে মধ্যযুগ

ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা ঃ প্রাচীন যুগে ইউরোপের রোম অর্থে, শক্তিতে, সাম্রাজ্য বিস্তারে ও সভ্যতায় যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল তা তোমরা পড়েছ। রোমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা হয়।

সভ্যতার পতনের কারণ ঃ ইতিহাস পড়লে দেখা যায় যে কোন সভ্যতাই চিরস্থায়ী হয়নি। খুব উঁচুতে গেলে সভ্যতার পতন হয়। এর কারণ কি? টাকা-পয়সা ও শক্তি বেড়ে গেলে মানুষের মনে অহংকার হয়—চরিত্রে নানা দুর্বলতার সৃষ্টি হয়। আলস্যে ও বিলাসে মানুষ গা ভাসিয়ে দেয়। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি সুরু করে। সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি আর তাদের থাকে না। তখন প্রয়োজন হয় সেই সব নতুন মানুষের, যারা পরিশ্রমী, চরিত্রবলে বলীয়ান, আর যারা সভ্যতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম।

বারবারিয়ানগণ ঃ প্রধানতঃ ওপরের কারণগুলির জন্য রোমের সভ্যতা যখন পতনের মুখে, তখন পশ্চিম এশিয়া ও জার্মানির পাহাড়-

পর্বতে বারবারিয়ানগণ বাস করত। তারা যাযাবর ছিল। অর্থাৎ স্থির হয়ে কোন জায়গায় তারা বেশী দিন বাস করত না—এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় ঘুরে বেড়াত। তারা খুব পরিশ্রমী ও সাহসী ছিল—ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করত। এই বারবারিয়ানরাই রোম সাম্রাজ্যের এখানে সেখানে আক্রমণ করে লুঠতরাজ করত।

রোম অধিকার ও ইউরোপে মধ্যযুগের আরম্ভ ঃ বারবারিয়ানদের এক জাতি খ্রীষ্টের জন্মের ৪৭৬ বছর পরে (৪৭৬ খ্রীঃ) রোমের তখনকার সম্রাটকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে রোম অধিকার করে। আমাদের সময় থেকে হিসেব করলে সে পনেরোশো বছরেরও আগের ঘটনা। রোমের পতনের বছর থেকে (৪০৬ খ্রীঃ) ইউরোপে মধ্যযুগের আরম্ভ বলে ধরা হয়। ঐ সময় ইউরোপের প্রায় সব দেশেই বিভিন্ন বারবারিয়ান জাতি প্রাধান্য লাভ করে—না বুঝে তারা সভ্যতার অনেক চিহ্ন ধ্বংস করে দেয়।

বারবারিয়ান জাতিদের রোমের সভ্যতা গ্রহণ আধুনিক যুগের সূচনা ঃ বারবেরিয়ান বা বর্বর জাতির লোকেরা গায়ের জোরে রোম দখল করলেও রোমের সভ্যতা ধীরে ধীরে তাদের জয় করে নেয়। রোমের সভ্যতার ভেতর বাস করে তারা ঐ সভ্যতার ভাষা ল্যাটিন ও গ্রীক্ শিখে নেয়। ফলে তারা রোমের ও গ্রীসের সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে। রোমের শিল্প, কলাবিদ্যা প্রভৃতিতেও তারা পারদর্শী হয়ে ওঠে। রোমের সভ্যতাকে নিজের করে গ্রহণ করে নিয়ে বারবারিয়ানরা আধুনিক যুগের পত্তন করে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা নতুন নতুন আবিষ্কার করতে থাকে। মানুষের নানা ধরণের চাহিদা মেটানোর জন্য তারা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী করে। ফলে মানুষের জীবনধারা পাল্টে যেতে থাকে—নতুন ধরণের সমাজের সৃষ্টি হয়। বড় সাম্রাজ্যের জায়গায়, এক এক জাতি নিজেদেয় জন্য এক একটি রাষ্ট্র গঠন করে। আধুনিক যুগের যাত্রা শুরু হয়।

ইউরোপে মধ্যযুগের পরিধি ঃ সাধারণভাবে ১৪৫৩ খ্রীঃ থেকে ইউরোপে আধুনিক যুগের আরম্ভ ধরা হয়। ৪৭৬ খ্রীঃ থেকে ১৪৫৩ খ্রীঃ পর্যন্ত, এক হাজার বছরের কিছু কম সময় হয়। এই সময়টাকেই ইউরোপে মধ্যযুগ বলা হয়।

উত্তর করে শেখো

১। সাধারণতঃ কি কারণে সভ্যতার পতন হয় ?
২। কিভাবে রোমের পতন হয় ও ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা হয় ?
৩। কিভাবে ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা হয় ?
৪। মধ্যযুগের পরিধি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

তৃতীয় পাঠ

ভারতবর্ষে মধ্যযুগ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন ও ভারতে মধ্যযুগের সূচনাঃ রোম-সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা হয়। ঠিক তেমনি, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সূচনা ধরা যেতে পারে। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়েছিল পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দ থেকে। আবার পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দেই রোমেরও পতন হয়।

বর্বর জাতির আক্রমণঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের জন্য হুণ নামে এক অসভ্য জাতির আক্রমণ অনেকখানি দায়ী ছিল। কিন্তু ইউরোপের মত এই জাতি কখনও ভারতবর্ষে বেশী সংখ্যায় বসবাস করে নি। ভারতবর্ষে মধ্যযুগ গড়ে ওঠায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনে সাহায্য করা ছাড়া তাদের অবদান তেমন কিছু নেই।

নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে বড় হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা আর তেমন সফল হয়নি। ফলে ভারতবর্ষ টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সব রাজ্যের মধ্যে সব সময় যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকায় ভারতীয় সভ্যতার এগিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যায়। এগিয়ে যেতে না পারলে সভ্যতাকে পেছিয়ে পড়তে হয়—এটাই সভ্যতা-বিকাশের ঐতিহাসিক নিয়ম।

সামন্ততন্ত্রের সৃষ্টিঃ এই ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্যেই সামন্ততন্ত্রের সৃষ্টি হয়। রাজার প্রধান সহায়কদের সামন্ত বলা হয়। এই সামন্তরা রাজার কাছ থেকে রাজ্যের সব জায়গা জমি নিজেরা ভাগ করে নেন। ঐ জমি গরীব চাষীদের দিয়ে চাষ করিয়ে নিজেরা অনেক টাকা-পয়সার মালিক হয়ে বসেন। রাজার সৈন্যবাহিনীতে সামন্তরাই প্রধান ছিলেন। দেশ শাসনের কাজও তাঁদের হাতে ছিল—সামন্তরাই ছিলেন রাজ্যে সর্বেসর্বা। সামন্তরা চাষীদের যেমন তেমনভাবে শোষণ করতেন। ফলে দেশের সাধারণ মানুষ খুব গরীব হয়ে পড়ল। সামন্তরা অতিরিক্ত ক্ষমতা ও টাকা-পয়সা পেয়ে বিলাসী, অত্যাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলেন। এই অবস্থায় সভ্যতার দ্রুত অধঃপতন হতে লাগল।

মুসলমানদের ভারত বিজয়ঃ ভারতবর্ষের যখন এমন দুর্দশা, তখন বাইরে থেকে এসে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ জয় করে নেয়। বারবারিয়ানদের মত তারা অসভ্য ছিল না। ভারতবর্ষে আসে তারা নিজেদের সভ্যতা নিয়ে। মুসলমানেরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ধ্বংস করে নিজেদের সভ্যতা ভারতের ওপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে।

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের প্রকৃত সূচনাঃ মুসলমান রাজত্বের সময় থেকে ভারতবর্ষে প্রকৃত মধ্যযুগের সূচনা ঘটে। মুসলমান ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে এসময় সংঘর্ষ হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে এক সভ্যতা অপর সভ্যতার কাছ থেকে দিতে ও নিতে আরম্ভ করে। এই দুই সভ্যতার মিলনের ফলে নতুনভাবে ভারতীয় সভ্যতা গড়ে উঠতে থাকে।

ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের সূচনাঃ এদিকে ইউরোপের বারবারিয়ান জাতিরা ততদিনে রোমের সভ্যতাকে গ্রহণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করে চলেছে। তারা ভারতে বাণিজ্য করতে আসে। বাণিজ্য করার সুযোগে ইংরেজ জাতি ভারতবর্ষে রাজত্ব বিস্তার করে বসে। ইংরেজদের অধীনে এসে ভারতবর্ষ ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসে। তখন থেকে ভারতে আধুনিক যুগের সূচনা ধরা যেতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পরই প্রকৃতপক্ষে ভারতে আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়েছে। আমরা বড় বড় কল-কারখানা স্থাপন করেছি, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের

চর্চায় তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলেছি, আর নতুন সমাজ ব্যবস্থা স্থাপন করতে চেষ্টা করেছি।

দেশে দেশে মধ্যযুগের প্রকৃতিতে তফাৎ : তোমরা ইউরোপে ও ভারতবর্ষে মধ্যযুগ সম্বন্ধে কিছু কিছু জেনেছ। তা' থেকেই বুঝতে পারছ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগের ইতিহাসে অনেক তফাৎ আছে। সব দেশে মধ্যযুগ একই সঙ্গে আরম্ভ বা শেষ হয়নি। এমনকি আমরা যে সভ্যতার ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক—এই তিন ভাগে ভাগ করে থাকি তা' শুধু আলোচনার সুবিধের জন্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে কোন ছেদ নেই, তাকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করা যায় না।

উত্তর করে শেখো

১। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন থেকে কেন ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সূচনা ধরা হয় ?

২। সামন্ততন্ত্রের সৃষ্টি কিভাবে ভারতীয় সভ্যতার পতনের পথে এগিয়েছে ?

৩। মুসলমান বিজয়ের পর থেকে কেন ভারতে প্রকৃত মধ্যযুগের আরম্ভ ধরা হয় ?

৪। আমরা কিভাবে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসি।

৫। স্বাধীনতালাভের পর থেকে ভারতে প্রকৃত আধুনিক যুগের আরম্ভ কেন ধরা হয় ?

চতুর্থ পাঠ

বারবেরিয়ান জাতির কথা

বারবেরিয়ান কথার অর্থ : ইংরেজীতে বারবেরিয়ান কথার অর্থ "অসভ্য বা বর্বর", ল্যাটিন ভাষায় (রোমানদের ভাষা) তার অর্থ "বিদেশী"। বারবেরিয়ানরা রোমের বাইরে থেকে এসেছিল বলে রোমানরা তাদের বিদেশী বা বারবেরিয়ান বলত। সভ্যতায় তারা যে রোমানদের তুলনায় প্রায় অসভ্য ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বাববেরিয়ানরা আর্য জাতির এক শাখা।

ইউরোপে বারবেরিয়ানদের বসবাস : বারবেরিয়ানদের বাসস্থান ছিল মধ্য ইউরোপের জঙ্গলপূর্ণ স্থানগুলিতে। এখানে তারা কোথা থেকে, কখন এসেছিল তা সঠিক বলা যায় না।

আলাদা আলাদা দলে ভাগ হয়ে তারা কাজ করত। পূর্বদিকে যারা থাকত তাদের অস্ট্রোগথ ও পশ্চিম দিকের বসবাসকারীদের ভিসিগথ বলা হত। আর এই দুই দলের মাঝখানে যারা থাকত তাদের নাম হয়েছিল ভ্যাণ্ডাল।

হূণ জাতির চাপ : এই সময় হূণ নামে আর এক যাযাবর জাতি বারবেরিয়ানদের আক্রমণ করে। এরা আর্য জাতির লোক ছিল না। এরা ছিল মোঙ্গল জাতের—চীন দেশের লোকের এক গোষ্ঠী। প্রথমে এরা মধ্য এশিয়ায় থাকত। খ্রীষ্টের জন্মের ৩৭০ বছর পরে (৩৭০ খ্রীঃ) এরা ইউরোপে ঢুকে বারবেরিয়ান জাতির উপর চাপ সৃষ্টি করে। এদেরই এক দল এই সময় ভারতবর্ষে ঢুকে গুপ্ত সাম্রাজ্যকেও আক্রমণ করে।

উত্তর করে শেখো

১। বারবেরিয়ান কথার অর্থ কি? এদের কেন বারবেরিয়ান বলা হত?

২। ইউরোপে বারবেরিয়ানদের বসবাস সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। হূণদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

পঞ্চম পাঠ

বারবেরিয়ান ও হূণদের রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ

বারবেরিয়ানদের রোমের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্তি : হূণদের চাপে পড়ে বারবেরিয়ানরা রোমান সাম্রাজ্যের ভেতর ঢুকে পড়ে। রোমের সম্রাট ছিলেন তখন থিয়োডিসিয়াস। বারবেরিয়ানদের তাড়িয়ে দেন এমন ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এদিকে বারবেরিয়ানরাও ছিল ভাল যোদ্ধা। তাই থিয়োডিসিয়াস তাদের খুশী করার জন্য রোমের সৈন্য-বাহিনীতে নিযুক্ত করেন

রোমান সাম্রাজ্যের দুই ভাগে বিভক্ত : থিয়োডিসিয়াসের মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্য পশ্চিম ও পূর্ব, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। থিয়োডিসিয়াসের এক ছেলে পশ্চিম ভাগের ও অপর ছেলে পূর্বভাগের সম্রাট হন।

ভ্যাণ্ডাল দলপতি ষ্টিলিকো : থিয়োডিসিয়াস ষ্টিলিকো নামে এক ভ্যাণ্ডাল দলপতিকে রোমের সেনাপতিরূপে নিযুক্ত করেন। থিয়োডিসিয়াস মারা গেলে ষ্টিলিকো, পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের নাবালক সম্রাটের অভিভাবক হয়ে দাঁড়ান। ইতিমধ্যে বারবেরিয়ানদের অন্যান্য দল রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে ষ্টিলিকো সাধ্যমত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ভিসিগথদের কাছে পরাজিত হলেন। তাঁর পরাজয়ের প্রধান কারণ—যুদ্ধক্ষেত্রে রোমান সৈন্যবাহিনী তাঁর আদেশ পালন করতে অস্বীকার করে। কিন্তু রোমের সম্রাট পরাজয়ের জন্য ষ্টিলিকোকেই দায়ী করেন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়।

এলারিকের রোম আক্রমণ : রোমান সৈন্যবাহিনীকে হারিয়ে ভিসিগথরা এগিয়ে চলে। তখন এলারিক ছিলেন তাদের দলপতি। ষ্টিলিকোর হত্যার পর এলারিককে বাধা দেওয়ার আর কেউ রইল না। খ্রীষ্টের জন্মের ৪১০ বছর পরে (৪১০ খ্রীঃ) এলারিক তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে রোমনগরের ভেতরে ঢুকে পড়েন। তিন দিন তিন রাত ধরে নগরে লুঠতরাজ চলে। তারপর এলারিক ফিরে যান। রোম বিজয়ের কিছুদিন পরেই এলারিক মারা যান। তাঁর আক্রমণ ও লুঠতরাজে রোম আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

হূণদের দলপতি এটিলা : হূণদের কথা তোমরা পড়েছ। হূণদের কথা বলতে গেলে তাদের দলপতি এটিলার কথা না বলে পারা যায় না। হূণ দলপতিদের মধ্যে তিনিই সব চাইতে বেশী নাম করেছিলেন। খ্রীষ্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে এটিলা ছিলেন হূণদের রাজা। এশিয়ার কাস্পিয়ান সাগর থেকে ইউরোপের রাইন নদী পর্যন্ত সমস্ত দেশই তার অধীনে ছিল। পূর্ব রোমান সম্রাট তাঁর আক্রমণে ভয় পেয়ে তাঁর সঙ্গে অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন।

এটিলার গল আক্রমণ : ৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে (খ্রীষ্টের জন্মের ৪৫১ বছর পরে), এটিলা পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের গলদেশ আক্রমণ

করেন। এই আক্রমণের মুখে পড়ে গলের অধিবাসী বারবেরিয়ান ও রোমানরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ভুলে গিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়ায়। ট্রয়েসের যুদ্ধক্ষেত্রে তারা মিলিতভাবে যুদ্ধ করে এটিলাকে রুখে দেয়। এটিলার এই পরাজয়ের ফলে ইউরোপে আর হূণ রাজ্য স্থাপিত হতে পারেনি।

এটিলার উপর পোপ লিওর প্রভাবঃ তখন রোমের পোপ ছিলেন লিও। হঠাৎ একদিন গলের পথে লিওর সঙ্গে এটিলার দেখা হয়ে যায়। এটিলা পোপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁর কথায় তিনি রোমের সম্রাটের সঙ্গে আর যুদ্ধ না করে সন্ধি করেন। এর অল্পদিন পরেই এটিলা মারা যান (৪৫৩ খ্রীঃ)।

এটিলার নিষ্ঠুরতাঃ এটিলার অনেক গুণ ছিল। তিনি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন—কিন্তু নিষ্ঠুরতায় তাঁর জুড়ি মিলিত না। তিনি গর্ব করে বলতেন, যেখান দিয়ে তাঁর সেনারা একবার গেছে, সেখানে অনেকদিন পর্যন্ত একগাছা ঘাসও জন্মাতে পারবে না। এর অর্থ তিনি যেখান দিয়ে যেতেন তার সব কিছুই ধ্বংস করে দিতেন। নিষ্ঠুরতার জন্য তাঁর নাম হয়েছিল "ভগবানের অভিশাপ"।

উত্তর করে লেখো

১। কখন রোমান সাম্রাজ্য দুভাগে বিভক্ত হয়? এই দুভাগের নাম কর।

২। ষ্টিলিকো কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। নীচের বাক্যাংশের মধ্যে যেগুলি, এলারিক সম্বন্ধে সত্য তার নীচে "এক" এবং যেগুলি এটিলার সম্বন্ধে সত্য তার নীচে "দুই" লেখ—

নিষ্ঠুর ছিলেন, রোমনগর লুঠ করেন, ভিসিগথদের দলপতি ছিলেন; লিওর প্রভাবে পড়েন; তাঁর আক্রমণে রোম আরও দুবল হয়ে পড়ে; ট্রয়েসের যুদ্ধে হেরে যান, কাস্পিয়ান সাগর থেকে রাইন নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত ছিল।

৪। (ক) ষ্টিলিকোকে হত্যার ফল কি হয়? (খ) ট্রয়েসের যুদ্ধের ফল কি?

ষষ্ঠ পাঠ

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন

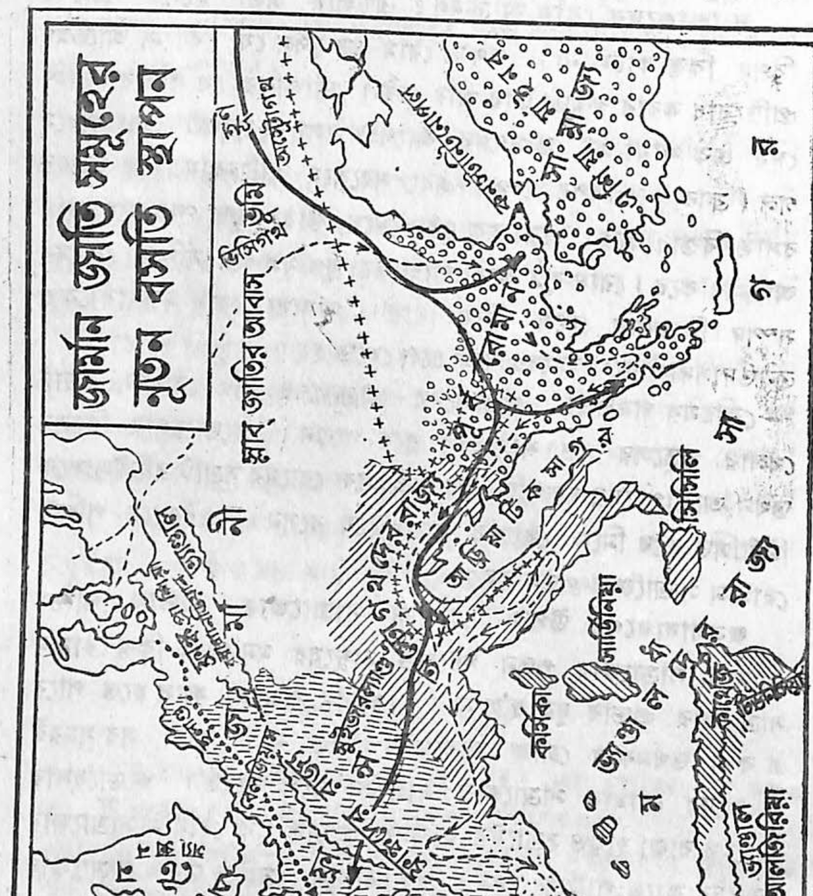
ভ্যাণ্ডালদের রোম আক্রমণঃ এটিলার মৃত্যু হলেও রোমের বিপদ কিন্তু কাটল না। তখন রোম এত দুর্বল যে, কোনো আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা তার আর নেই। ভ্যাণ্ডালরা যে বারবেরিয়ান-দের এক শাখা তা তোমাদের আগেই বলা হয়েছে। এরা প্রথমে গল (ফ্রান্স) তারপর স্পেন এবং সবশেষে আফ্রিকায় গিয়ে তাদের বসতি বিস্তার করে। রোমকে দুর্বল দেখে তারা সমুদ্র পার হয়ে রোম আক্রমণ করে। রোম লুঠ করে ভ্যাণ্ডালরা যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত রোমের সম্পদ নিজেদের দেশে নিয়ে যায়। অসংখ্য রোম নরনারীকেও ক্রীতদাসদাসীরূপে তাদের সঙ্গে চলে যেতে হয়।

রোমের পতনঃ ভ্যাণ্ডালদের আক্রমণের পর রোমান সম্রাট খেলার পুতুলের মত শক্তিহীন হয়ে পড়েন। ওডোয়েসার ছিলেন তখন অস্ট্রোগথদের দলপতি। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের সম্রাট রমিউলাসকে নির্বাসিত করে নিজে রোমের রাজা হয়ে বসেন। এইভাবে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়।

জনসাধারণের উপর রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবঃ পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও মানুষের মন থেকে কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাব দূর হ'ল না। রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে পারে এ কথা তখনকার লোক ভাবতেই পারত না। তারা সব সময়ই নিজেদের রোমান সাম্রাজ্যের নাগরিক বলে ভাবত। ওডোয়েসার রোমের রাজা হয়েও সম্রাটের রাজদণ্ড প্রভৃতি পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেন। পূর্ব রোমান সম্রাটও তাঁকে সাম্রাজ্যের একজন "প্যাট্রিসিয়ান" বলে স্বীকার করে নেন।

রোমান আইনের প্রভাবঃ রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবের সঙ্গে রোমের পতনের পরেও রোমান আইন কানুনের প্রভাব লোকের মনে থেকে যায়। বিশাল রোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল, তার আইন-কানুন। সাম্রাজ্যের পতনের পর যে যেখানেই রাজত্ব করুক না কেন, তাঁরা রোমান আইন-কানুন অনুসারেই সাম্রাজ্য শাসন করতে থাকেন।

রোমান সাম্রাজ্যে বারবেরিয়ানদের বসতি : অস্ট্রোগথ, ভিসিগথ ও ভ্যাণ্ডাল—বারবেরিয়ানদের এই তিন শাখার কথা তোমাদের আগে বলা হয়েছে। পরে বারবেরিয়ানরা আরও বহু দলে ভাগ হয়ে বহু



নামে পরিচিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি হল, বার্গানডিয়ান, লনবার্ড, ফ্রাঙ্ক, জুট, অ্যাঙ্গল ও স্যাক্সন।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় কোন্ দল কোথায় কাজ করত পূর্বের পৃষ্ঠার ম্যাপে দেখ।

১। গ্রীস নিয়ে ইউরোপের পূর্ব অঞ্চলে তখন পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বর্তমান। ২। সমস্ত ইটালি ও তার উত্তরের কিছু কিছু জায়গা নিয়ে ছিল অস্ট্রোগথদের রাজত্ব। ৩। পশ্চিম দিকে প্রাশিয়ায় ছিল বার্গানডিয়ানদের আধিপত্য। ৪। আরও উত্তর পশ্চিমে (বর্তমান ফ্রান্স) ছিল ফ্রাঙ্কদের বসবাসের ক্ষেত্র। দক্ষিণ পশ্চিমে (বর্তমান স্পেন) ভিসিগথরা রাজ্য বিস্তার করে। ৬। আর একেবারে দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে আফ্রিকার উপকূলে ভ্যাণ্ডালদের বসতি। ৭। উত্তরে যেখানে, বর্তমান ডেনমার্ক, গ্রেট ব্রিটেন সেখানে অ্যাঙ্গল, জুট, স্যাক্সন প্রভৃতি জাতির বাস।

বারবেরিয়ানদের সমাজ জীবন—গ্রামে বসবাস : বারবেরিয়ানরা একত্র হয়ে ছোট ছোট গ্রামে বাস করত। তাদের ঘরবাড়ী প্রধানতঃ কাঠ ও মাটি দিয়ে তৈরী হত। গ্রামগুলো কাঠের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকত।

জীবিকা : তারা প্রধানতঃ পশুপালক কিন্তু খাদ্যশস্য ও আপেলের চাষও করত। বন্য পশু শিকার ও মাছ ধরার কাজেও তারা ওস্তাদ।

যুদ্ধপটুতা : যুদ্ধ ছিল বারবেরিয়ানদের জীবনের অঙ্গ। তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সব সময় তৈরী থাকত। কোথাও পদাতিক আবার কোথাও বা অশ্বারোহীরূপে তারা যুদ্ধ করত। তারা হাতে ঢাল, গায়ে বর্ম ও মাথায় শিরস্ত্রাণ পরত। প্রয়োজনে পুরুষদের যুদ্ধে সাহায্য করতে মেয়েরাও এগিয়ে আসত।

নারীর স্থান : পুরুষরা সাধারণতঃ এক স্ত্রীকে নিয়েই ঘর-সংসার করত। নারীর স্থান প্রধানতঃ গৃহে হলেও, সব কাজেই তারা পুরুষদের সাহায্যে এগিয়ে আসত। পুরুষরা নারীদের সম্মান দেখাত।

আমোদ-প্রমোদ : যুদ্ধ না থাকলে বারবেরিয়ানরা আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাত। জুয়া খেলা, মদ খাওয়া, রথের দৌড়ের প্রতিযোগিতা এসব ছিল তাদের আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ।

ধর্ম : বারবেরিয়ানরা নানা দেবতার পূজা করত। তাদের যুদ্ধের দেবতার নাম ছিল ওডেন। এছাড়া থর প্রভৃতি অন্যান্য দেবতারও পূজো তারা করত। তোমরা হয়ত জান না, ওডেনের নাম থেকে ওয়েডনেসডে ও থরের নাম থেকে থার্সডে নাম এসেছে।

রাজনৈতিক জীবন ঃ কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি হানড্রেড বা ট্রাইব সৃষ্টি হত। কয়েকটি হানড্রেড বা ট্রাইব নিয়ে একটি রাজ্য গঠিত হত। প্রত্যেক হানড্রেডের একজন করে দলপতি থাকতেন। রাজ্যের ওপর রাজা রাজত্ব করতেন।

রাজ্যের বড় বড় সমস্যায় স্বাধীন যোদ্ধারা সব একত্র মিসে কি করতে হবে তা' ঠিক করতেন।—এ যেন অনেকটা আমাদের বিধান সভার মত।

রোমানদের সঙ্গে মিশে যাওয়া ঃ জার্মানরা বাইরে থেকে এসে রোমান সাম্রাজ্যে বসবাস করলেও তারা ধীরে ধীরে রোমানদের আচার-ব্যবহার নিজেদের করে নেয়। এইভাবে বারবেরিয়ানরা রোমানদের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়।

খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব ঃ বারবেরিয়ান ও রোমানদের মধ্যে মিলনে খ্রীষ্টধর্ম যথেষ্ট সাহায্য করে। বারবেরিয়ানরা ধীরে ধীরে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। রোমানরা আগেই এই ধর্ম গ্রহণ করেছে। ফলে উভয়ের ধর্ম এক হওয়ায় উভয়েব অনেক আচার ব্যবহারও এক হয়ে যায়। এমনকি পরস্পরের মধ্যে বিবাহপ্রথাও প্রচলিত হয়।

ইউরোপের সভ্যতার ওপর বারবেরিয়ান আক্রমণের ফলাফল ঃ বারবেরিয়ান আক্রমণের ফলে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠে। বারবেরিয়ানদের এক এক শাখা বা জাতি এক এক রাজ্যে রাজত্ব করতে থাকে। যেমন গথ জাতি স্পেনে, ফ্রাঙ্ক জাতি ফ্রান্স ও জার্মানিতে এবং অ্যাঙ্গল, সাক্সন ও জুট জাতি ইংলণ্ডে রাজত্ব আরম্ভ করে।

উত্তর করে দেখো

১। ভ্যাণ্ডালদের রোম আক্রমণের ফল কি হয়েছিল ?

২। কখন ও কিভাবে রোমের পতন হয় লেখ।

৩। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরও জনসাধারণের ওপর কিভাবে সাম্রাজ্যের ও তার আইন কানুনের প্রভাব রয়ে গিয়েছিল ব্যাখ্যা কর।

৪। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সময় বারবেরিয়ানরা কোথায় বাস করত ম্যাপ এঁকে দেখাও।

৫। বারবেরিয়ানদের জীবন সম্বন্ধে একটি রচনা লেখ।

———

সপ্তম পাঠ

অন্ধকার যুগ

অন্ধকার যুগ : চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের শেষ থেকে, ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত এই তিনশো বছর সময়কে, অনেকদিন থেকে আমরা ইউরোপের সভ্যতার "অন্ধকার যুগ" নামে অভিহিত করে আসছি।

অন্ধকার যুগ নাম দেওয়ার কারণ : ১। এই সময়ের মধ্যে হূণরা রোমান সাম্রাজ্যকে বারবার আক্রমণ করেছে। তারা যে দিকে গেছে ঘরবাড়ী, জায়গা জমি ও সভ্যতার চিহ্ন—সব ধ্বংস করে দিয়েছে।

২। এই সময়ই বারবেরিয়ানরা রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। যারা ইউরোপে তাদের রাজ্য স্থাপন করেছিল তারা বারবার রোমনগর লুণ্ঠন করে তার সভ্যতার চিহ্নগুলো ধ্বংস করে দেয়। গল্প আছে যে এক বারবেরিয়ান সেনাপতি রোমের এক উদ্যানে দেখতে পান, ফোয়ারার নীচে জলে কৃত্রিম রাজহাঁস ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি এসব আজগুবি কাণ্ড কারখানা দেখে তলোয়ার ফেলে রাজহাঁস সহসব ধ্বংস করে দেন। এইভাবেই চলেছিল সভ্যতা ধ্বংসের লীলা।

৩। শুধু তাই নয়। বারবেরিয়ানরা ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা বুঝত না। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। ইউরোপে তখন কেবল যুদ্ধ—মানুষের মনে আতঙ্ক। সভ্যতার আলো প্রায় নিভে গেছে। তাই তিনশো বছরের এই যুগকে "অন্ধকার যুগ" বলা হয়।

অন্ধকারের মধ্যেআলো : কিন্তু এই যুগকে অন্ধকারের যুগ বললে একেবারে ঠিক কথা বলা হবে না। বারবেরিয়ানরা "অসভ্য" হলেও অল্পদিনের মধ্যে তারা রোমান সভ্যতাকে শ্রদ্ধা করতে সুরু করে। তাই পরবর্তীকালে রোমান সভ্যতার চিহ্ন তারা আর ধ্বংস করেনি।

অন্যদিকে ইউরোপের সব জায়গায় খ্রীষ্টানধর্মের প্রচার হয়। বারবেরিয়ানরাও এই ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্মযাজকরা ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার চর্চা বজায় রাখেন। তাঁরা অনেক মঠ তৈরী করেন। মঠগুলিতে জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখানো হত। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।

অন্ধকারের মধ্যেও আলো ক্ষীণ হয়ে জ্বলছিল। এই সময়কে নতুন যুগের জন্য প্রস্তুতির সময় বলা চলে। কারণ এই সময়ের মধ্যে বারবেরিয়ানরা সভ্য হচ্ছিল, খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করছিল, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিখছিল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা কিছু কিছু আরম্ভ করছিল।

উত্তর করে লেখো

১। কোন্ সময়কে ইউরোপের ইতিহাসে অন্ধকার যুগ বলা হয়?

২। এই সময়কে অন্ধকার যুগ বলার কারণ কি?

৩। এই অন্ধকার যুগেও আলোর রেখা কি করে দেখা যাচ্ছিল আর নতুন যুগের প্রস্তুতি কিভাবে চলছিল তা ব্যাখ্যা কর।

অষ্টম পাঠ

সভ্যতার আলো জ্বালিয়ে রাখায় খ্রীষ্টধর্ম

বারবেরিয়ানদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ: রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর খ্রীষ্টধর্ম সভ্যতার প্রধান বাহক হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মযাজকেরা ঘুরে ঘুরে বারবেরিয়ানদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিতে থাকেন। ধীরে ধীরে ইউরোপের সব লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে। রোমের সম্রাটেরা প্রথমে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁরা এই ধর্ম গ্রহণ করেন—তার রক্ষক হয়ে দাঁড়ান।

রোমান সাম্রাজ্যের অনুকরণে খ্রীষ্টান চার্চের প্রশাসন: খ্রীষ্টান চার্চ সারা পৃথিবীতে ধর্মের সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এর প্রশাসনের জন্য চার্চ, রোমান সাম্রাজ্যের অনুকরণ করে। রোমের সম্রাট যেমন ছিলেন রোমান সাম্রাজ্যে সকলের ওপরে, তেমনি রোমে যিনি চার্চে প্রধান ছিলেন, তিনি ছিলেন খ্রীষ্টান চার্চে সকলের ওপরে। তাঁকে পোপ বলা হয়। পোপের অধীনে প্রত্যেক রাজ্যে

থাকতেন প্রধান বিশপ। বিশপের অধীনে থাকতেন চার্চের আরও নানা ধরনের কর্মচারী। আজও পোপ সারা পৃথিবীতে ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের প্রধান। এখনও রাজ্যে রাজ্যে প্রধান বিশপ ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা একই ভাবে চার্চের প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছেন।



খ্রীষ্টান চার্চ

চার্চের প্রভাব ঃ চার্চ যেন দ্বিতীয় রোমান সাম্রাজ্য হয়ে দাঁড়ায়। চার্চের প্রশাসন ভাল থাকায় রোমান সাম্রাজ্যের মত চার্চ ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোককে একতার বাঁধনে বাঁধতে সক্ষম হয়। ইউরোপের সকল লোকের ওপর চার্চের প্রভাব গভীরভাবে পড়ে।

রোমান সভ্যতার বাহক হিসাবে চার্চ ঃ চার্চ রোমান সাম্রাজ্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল। রোমের ভাষা ল্যাটিন, সে নিজের ভাষা হিসাবে নিয়েছিল। এছাড়া চার্চে গ্রীক ভাষার চর্চাও হত। বারবেরিয়ানদের মধ্যে যারা খ্রীষ্টান হত তাদের অনেকে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিখত। প্রাচীন সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান সব ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় লেখা ছিল। এই দুই ভাষার চর্চা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্য ও প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা চার্চে হতে থাকে।

চার্চের মাধ্যমে বাইরের লোকও এসবের চর্চা কিছু কিছু করতে শেখে। এভাবে চার্চ অন্ধকার যুগে সভ্যতার আলো জ্বালিয়ে রাখতে সক্ষম হয়।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি: এই সময় খ্রীষ্টান ধর্মে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ধর্মের আকর্ষণে অনেকে সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যান। এঁদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ দুই-ই ছিলেন।

সন্ন্যাসীদের উচ্চ আদর্শের জীবন: সবরকম বিলাস-ব্যসন ছেড়ে সন্ন্যাসীরা খুব কঠোর জীবন-যাপন করতেন। সকলকে ভালবাসা এবং গরীব দুঃখীর সেবা নিয়েই তাঁরা থাকতেন। জনসাধারণকে ভাল করা এবং তাদের শিক্ষা দেওয়ার কাজে নিজেদের সর্বদা ব্যাপৃত রাখতেন।

জনসাধারণের ওপর সন্ন্যাসীদের জীবনের প্রভাব: জীবনের উচ্চ আদর্শের জন্য জনসাধারণ সন্ন্যাসীদের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। অনেকেই তাঁদের উচ্চ আদর্শের কিছু কিছু অনুকরণ করতে চাইত। ফলে ইউরোপের লোকের নৈতিক জীবনের অনেক উন্নতি ঘটতে থাকে।

মঠ স্থাপন: সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় মঠ স্থাপন করেন। এই সব মঠে অনেক সন্ন্যাসী একত্রে বাস করতে থাকেন। মঠগুলিতে দর্শনশাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতির চর্চা হত। মঠগুলি সব বিদ্যালয়ের কাজও করত। এগুলিতে জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখান হত; পরে অবশ্য অনেক মঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নিয়েছিল।

উত্তর করে শেখো

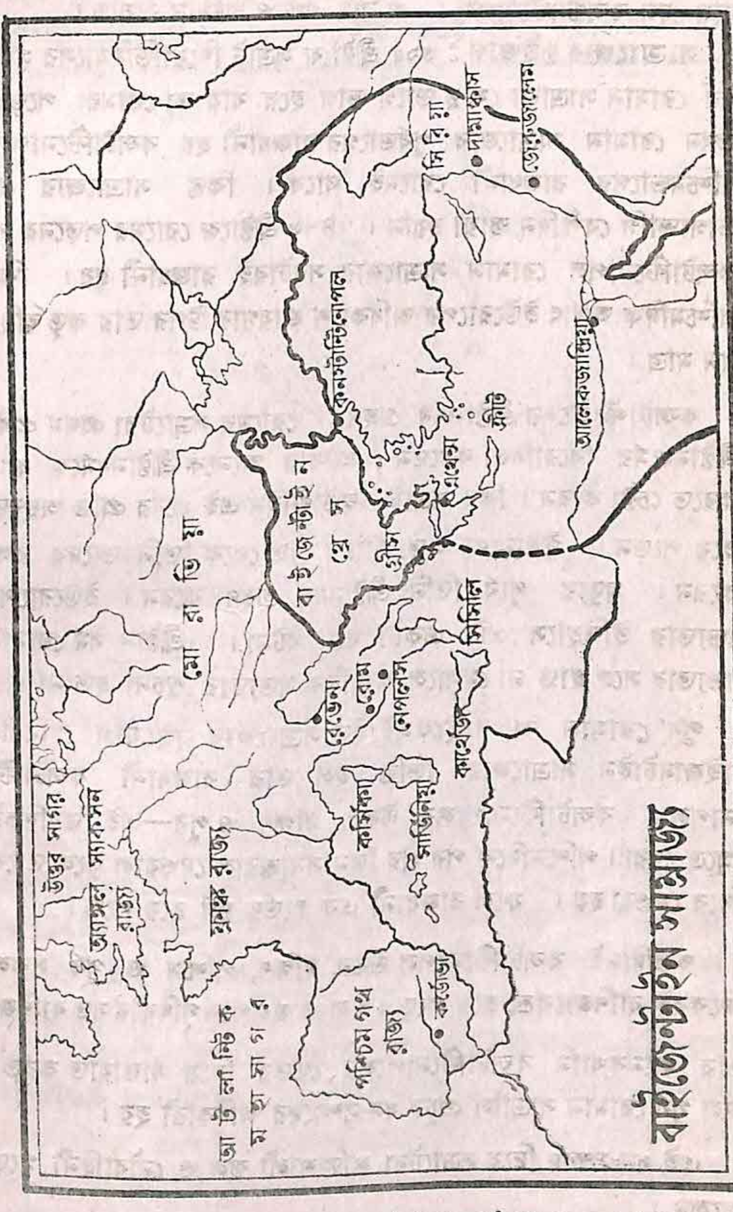
১। চার্চ কিভাবে রোমান সভ্যতার বাহক হয়েছিল ব্যাখ্যা করে বল।
২। কাকে পোপ বলা হয়?
৩। সভ্যতার আলো জ্বালিয়ে রাখায় সন্ন্যাসী ও মঠদের অবদানের বিষয় আলোচনা কর।

নবম পাঠ

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য

বাইজান্টিয়াম নগরে রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন: রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন বিশাল হয়ে পড়েছিল। ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশ নিয়ে ছিল তার বিস্তার। এই রোম বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে সাম্রাজ্যের মাঝখানে অবস্থিত ছিল না। তাই মোটামুটি সাম্রাজ্যের মাঝখানে পড়বে ভেবে রোমান

সম্রাট ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্‌টিয়াম নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত



করেন। সে আজ থেকে প্রায় ছ'হাজার ছ'শো বছর আগের কথা। বাইজান্‌টিয়াম নগরের অবস্থান হল, ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগ-

স্থলে। সম্রাট কন্সটান্টাইন এই শহরকে নতুন করে তৈরী করেন— নাম দেন কন্সণ্টান্টিনোপল। এ নাম এখনও বর্তমান রয়েছে।

সাম্রাজ্যের দুইভাগ ঃ ৩৯৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট থিয়োডিসিয়াসের মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্য যে দু ভাগে ভাগ হয়ে যায় তা তোমরা পড়েছ। তখন রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বভাগের রাজধানী হয় কন্সটান্টিনোপল। পশ্চিমভাগের রাজধানী রোমেই থাকে। কিন্তু সাম্রাজ্যের এই ভাগাভাগি বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পতনের পর কন্সটান্টিনোপল রোমান সাম্রাজ্যের সবটারই রাজধানী হয়। কিন্তু পশ্চিমদিক অর্থাৎ ইউরোপের অধিকাংশ জায়গার উপর তার কর্তৃত্বছিল নাম মাত্র।

কন্সটান্টাইনের খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ ঃ রোমের সম্রাটেরা প্রথম প্রথম খ্রীষ্টানধর্মের বিরোধিতা করতেন; আবার অনেকে খ্রীষ্টানধর্মকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্রাট কন্সটান্টাইন এই ধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। খ্রীষ্টানদের অত্যাচারের হাত থেকে তিনি তাদের রক্ষা করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন। ইউরোপের সভ্যতার ইতিহাসে এটা একটা বড় ঘটনা। খ্রীষ্টান ধর্ম রোমান সভ্যতার সঙ্গে হাত না মেলালে আধুনিক সভ্যতার সূচনা হত না।

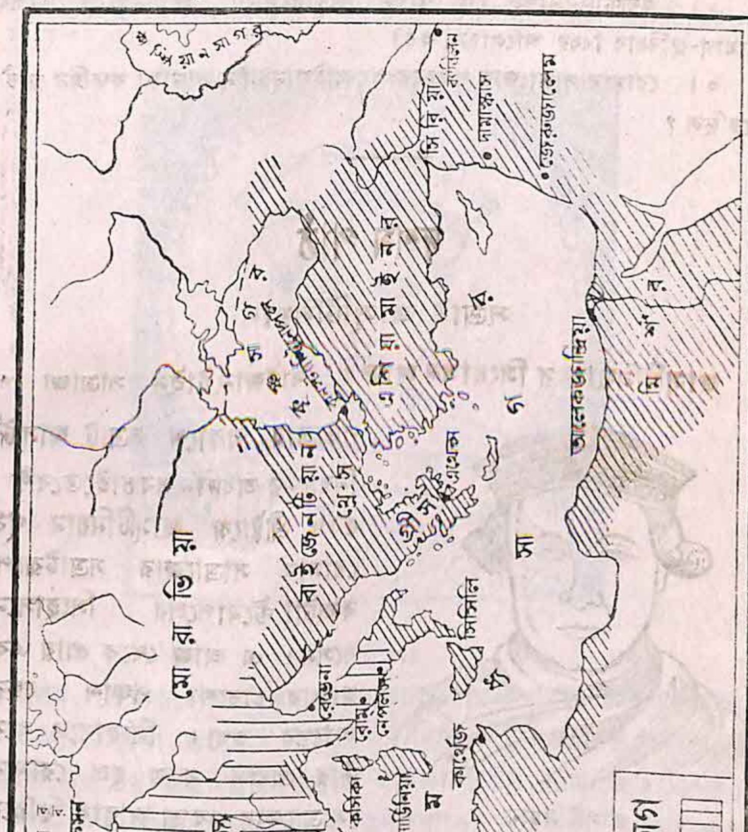
পূর্ব রোমান বা বাইজেন্টাইন সম্রাজ্যের সুযোগ সুবিধা ঃ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভিত্তি হল তার রাজধানী কন্সটান্টিনোপল। কন্সটান্টিনোপলের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব—এই তিনদিকই সমুদ্রে ঘেরা। পশ্চিমদিকে পর পর তিন সমান্তরাল দেওয়াল তুলে তাকে ঘিরে দেওয়া হয়। ফলে রাজধানী এক দুর্ভেদ্য দুর্গ হয়ে পড়ে।

অল্পদিনেই কন্সটান্টিনোপল উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব সকল দিকেরই বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে পড়ে। স্থল ও জলপথে পৃথিবীর যত বাণিজ্য তার অনেকখানি কন্সটান্টিনোপলের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করত। ফলে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হয়।

এই ধন-সম্পদ দিয়ে সম্রাটেরা শক্তিশালী স্থল ও নৌবাহিনী গড়ে তুলেন।

পূর্ব্ব রোমান সাম্রাজ্যের পরিধি ঃ পরের পাতায় ম্যাপ দেখ।

দক্ষিণে মিশর সহ আফ্রিকার উত্তর উপকূল ও ভূমধ্যসাগরের প্রধান প্রধান দ্বীপগুলি পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের ভেতর ছিল। উত্তরে গ্রীস তার



অংশ ছিল। পশ্চিমে স্পেনের দক্ষিণ অংশ ও পূর্বে সিরিয়া পর্যন্ত এই সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল।

উত্তর করে শেখো

১। ম্যাপ এঁকে পশ্চিম ও পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিভক্তিকরণ দেখাও।

২। কন্সটান্টিনোপল কে স্থাপন করেছিলেন। এই নগরের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার বিষয় আলোচনা কর।

৩। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য কতদিন স্থায়ী হয়েছিল?

দশম পাঠ

সম্রাট জাস্টিনিয়ান

জাস্টিনিয়ানের সিংহাসন লাভঃ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও সভ্যতার বিকাশে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের অবদান সবচাইতে বেশী। ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাস্টিনিয়ান পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটরূপে কন্সটান্টিনোপলের সিংহাসনে বসেন। এ আজ থেকে প্রায় এক হাজার চারশো পঞ্চাশ বছর আগের কথা। সিংহাসনে বসে তাঁর প্রধান কাজ হল রোমান সাম্রাজ্যের একতা আবার ফিরিয়ে আনা। পশ্চিমদিকের রাজ্যগুলি প্রকৃতপক্ষে বারবেরিয়ানদের অধীনে ছিল। এইসব রাজ্যের ওপর সম্রাটের কর্তৃত্ব আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। এই উদ্দেশ্যে জাস্টিনিয়ান দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলেন। রাতে তিনি প্রায়ই ঘুমোতেন না। সাধারণ লোকেরা তাকে দানব বলে মনে করত; কারণ তখনকার দিনে মানুষের বিশ্বাস ছিল দানবেরা ঘুমোয় না।



জাস্টিনিয়ান

রাণী থিয়োডরাঃ জাস্টিনিয়ানের রাণীর নাম থিয়োডরা। তিনি এক সার্কাসের কর্মীর মেয়ে। জাস্টিনিয়ান রাজপুত্র থাকার সময় তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। থিয়োডরা জাস্টিনিয়ানের উপযুক্ত

সহধর্মিণী—বিপদের সময় প্রাণ তুচ্ছ করে স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। তাঁর সাহসে সাহসী হয়ে জাস্টিনিয়ান বিপদের সময়েও সঠিক পথে চলতে সক্ষম হন।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সমস্যা : সিংহাসনে বসে জাস্টিনিয়ান



রাণী থিয়োডরা

দেখলেন যে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বারবেরিয়ান ও হূণরা তাঁর সাম্রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে পারস্য সাম্রাজ্য। পারস্য সম্রাটের লুব্ধ দৃষ্টিও রয়েছে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের ওপর। জাস্টিনিয়ান তাঁর সেনাপতি বেলিসেরিয়াসের সাহায্যে উভয়দিকের বিপদ থেকেই সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। তিনি এদের আক্রমণ রুখতে না পারলে, ইউরোপ হয়ত আবার নতুন বিপদের সামনে পড়ত। ফলে ইউরোপে সভ্যতার বিকাশ হয়ত আরও পেছিয়ে পড়ত।

লুপ্ত সাম্রাজ্য উদ্ধার : জাস্টিনিয়ান বারবেরিয়ানদের হাত থেকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য উদ্ধারের ভারও সেনাপতি বেলিসেরিয়াসের হাতে অর্পণ করেন। বেলিসেরিয়াস আফ্রিকা থেকে ভ্যাণ্ডালদের তাড়িয়ে দেন ও কার্থেজ দখল করেন। ভিসিগথদের হাত থেকে তিনি স্পেনের কিছু অংশ উদ্ধার করেন। ৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলিসেরিয়াস রোম জয় করেন।

জাস্‌টিনিয়ানের ব্যর্থতা : সাময়িকভাবে রোমান সাম্রাজ্যের কিছু কিছু রাজ্য আবার উদ্ধার করলেও পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য আবার এক করার স্বপ্ন জাস্‌টিনিয়ানের সফল হয়নি। তিনি মারা যাওয়ার পরই বিজিত রাজ্যগুলি আবার আগেরই মত বার বেরিয়ানদের হাতে চলে যায়।

বেলিসেরিয়াসের শেষ জীবন : মধ্যযুগের বিখ্যাত সেনাপতি বেলিসেরিয়াসের শেষ জীবন সম্বন্ধে তোমাদের জানা ভাল। তিনি শেষ জীবনে জাস্‌টিনিয়ানের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। সম্রাট তাঁকে পদচ্যুত করে কারারুদ্ধ করেন। তাঁর সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে জাস্‌টিনিয়ান নিজের ভুল বুঝতে পারেন। বেলিসেরিয়াসকে মুক্তি দেন এবং তাঁর সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন।

উত্তর করে শেখো

১। জাস্‌টিনিয়ানের জীবনের উদ্দেশ্য কি ছিল? তিনি কিভাবে এ উদ্দেশ্য কতখানি সফল করতে পেরেছিলেন?

২। বেলিসেরিয়াস সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। জাস্‌টিনিয়ান কিভাবে ইউরোপের সভ্যতাকে নতুন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন?

একাদশ পাঠ

জাস্‌টিনিয়ানের সুশাসন

নিকা বিদ্রোহ দমন : রাজ্যের ভেতর থেকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যাতে কেউ ষড়যন্ত্র না করতে পারে সেদিকে জাস্‌টিনিয়ানের নজর ছিল কড়া। তাঁর সিংহাসনে বসার অল্পদিনের মধ্যেই কন্সটান্টিনোপলের কিছু লোক রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। পাঁচদিন রাজধানী বিদ্রোহীদের দখলে থাকে। কিন্তু জাস্‌টিনিয়ান তাঁর সৈন্যবাহিনী দিয়ে বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলেন। তারপর নিষ্ঠুরভাবে বিদ্রোহীদের হত্যা করা হয়। শত শত মৃতদেহ মাঠের মধ্যে পড়ে থাকে। এই নিষ্ঠুরতার জন্য জাস্‌টিনিয়ানকে নিন্দা করা হয়। এরপর জাস্‌টিনিয়ানের রাজত্বকালে আর কোন বিদ্রোহ হয়নি। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ নিকা বিদ্রোহ নামে খ্যাত। 'নিকা' অর্থ বিজয়।

আইন বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজন : আমরা সকলেই জানি যে নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখে যদি সুখে-শান্তিতে থাকতে হয় তাহলে ভাল আইনের খুব প্রয়োজন। ভাল আইন না থাকলে রাজা যেমন খুশী লোকের ওপর অত্যাচার করতে পারেন ; আবার সবলের হাত থেকে দুর্বলের রক্ষা পাওয়ার পথও ঐ আইন। তাই পৃথিবীর সকল দেশেই ভাল আইন ও ভাল বিচার-ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার যে কোন দেশের আইন একদিনে গড়ে ওঠে না। সব আইন একত্র করে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এক মস্ত বড় কাজ। রোম যে এত বড় সাম্রাজ্য গড়েছিল, আর এই সাম্রাজ্যের লোকেরা যে সুখে-শান্তিতে বাস করত, তার মূলে রয়েছে রোমের আইন ও বিচার ব্যবস্থা।

বহু বছর ধরে এই আইন বাস্তব প্রয়োজনে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। বিশাল সাম্রাজ্যের সব জায়গায় আইন যে একই ধরনের ছিল তাও না। বহু আইনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কেউ লিখতে চেষ্টা করে নি। ফলে আইন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ না হলে, বিচার করতে অসুবিধে হয়।

সুশাসক জাস্‌টিনিয়ান সম্রাট হয়েই রোমান আইন বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজন মনে করেন।

জাস্‌টিনিয়ানের আইন : জাস্‌টিনিয়ান তাঁর মন্ত্রী ট্রিবোনিয়ানের নেতৃত্বে এক আইন কমিশন গঠন করেন। পাঁচ বছরেরও বেশী কঠোর পরিশ্রম করে এই কমিশন রোমান সামাজ্যের ভেতরে প্রচলিত সব আইনগুলিকে একত্র ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন এবং সহজে খুঁজে পেয়ে যাতে আইনগুলিকে ব্যবহার করা যায় তার জন্য তাদের এক সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করেন। এই আইন সঙ্কলন 'জাস্‌টিনিয়ানের আইন' নামে খ্যাত।

জাস্‌টিনিয়ানের আইন সঙ্কলনের গুরুত্ব : জাস্‌টিনিয়ানের আইনকে ভিত্তি করে ইউরোপের প্রায় সকল দেশের আইন গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ, সিংহল প্রভৃতি দেশের আইনেও, জাস্‌টিনিয়ানের আইনের প্রভাব আছে। জাস্‌টিনিয়ান যদি আইনগুলি সঙ্কলিত না করতেন, তবে তা হয়ত নষ্ট হয়ে যেত। পৃথিবীর সভ্যতা এক অমূল্য রত্ন থেকে বঞ্চিত হত।

উত্তর করে শেখো

১। নিকা বিদ্রোহ দমনে জাস্টিনিয়ানের সুশাসনের কি পরিচয় পাও?

২। রোমান আইন বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজন কেন হয়েছিল আলোচনা কর।

৩। জাস্টিনিয়ানের আইন কাকে বলে? পৃথিবীর ইতিহাসে এই আইনের গুরুত্ব কি?

দ্বাদশ পাঠ

বাইজান্টাইন সভ্যতা

অর্থ সম্পদ : যে কোন সভ্যতার বিকাশের দু'টি মূল কারণ থাকে—সুশাসন ও অর্থ সম্পদ। অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি পায় বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্যের ভেতর দিয়ে। কন্সটান্টিনোপল পৃথিবীর বাণিজ্যের যে এক প্রধান কেন্দ্র ছিল তা আগেই বলা হয়েছে।

জাস্টিনিয়ান সম্রাট হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দিলেন। তিনি বড় বড় রাস্তা তৈরী করান ও অনেক নদীর ওপর সেতু তৈরী করান। এতে যাতায়াতের সুবিধের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সুবিধে হয়। জাস্টিনিয়ান নিজের দেশে সিল্কের কাপড়ের ব্যবসা গড়ে তুলবেন বলে ঠিক করেন। তখনকার দিনে সিল্কের ব্যবসায় চীনের একচেটিয়া ছিল। গুটিপোকা থেকে সিল্ক হয় তা তোমরা সম্ভবতঃ জান। চীন গুটিপোকার চাষ করত। কিন্তু বিদেশে সেকখনও গুটিপোকা পাঠাতনা। জাস্টিনিয়ান লোক পাঠিয়ে চীন থেকে গুটিপোকার ডিম আনিয়ে নেন। তারপর ডিম ফুটিয়ে গুটিপোকা বের করে দেশে গুটিপোকার চাষ আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যে সিল্ক শিল্প গড়ে ওঠে।

জাস্টিনিয়ান নানা সংস্কার প্রবর্তন করে কৃষি-ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটান।

ব্যবসা-বাণিজ্য : বিদেশের সঙ্গে বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের বাণিজ্য খুব বিস্তৃত ছিল। আফ্রিকার অ্যাবেসিনিয়া থেকে আসতো হাতির দাঁত, সোনা ও মাণিক। ভারত ও সিংহল পাঠাত মশলা, গন্ধদ্রব্য ও

দামী পাথর বাইজান্টিয়াম ঐসব দেশে রপ্তানি করত, কাচের ও এনামেলের তৈরী জিনিস, সোনা ও পাথরের জিনিস। এছাড়া ইউরোপে সিল্কের কাপড়ও পাঠন হত। বাণিজ্য চলত স্থল ও নৌ-পথে।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষবাসের ভেতর দিয়ে বাইজান্টাইনদের হাতে প্রচুর টাকা পয়সা হল।

ঘরবাড়ী তৈরী করার শিল্পের বিকাশ ঃ প্রচুর টাকা-পয়সা হাতে থাকায় বাইজান্টাইন সম্রাটেরা বড় বড় প্রাসাদ, গির্জা, মঠ



সেণ্ট সোফিয়ার গীর্জা

প্রভৃতি তৈরীর কাজে হাত দিতে সক্ষম হন। এসব তৈরী করায় প্রাচীন গ্রীসের নিমাণ শৈলীর সঙ্গে পূর্বদেশীর নির্মাণ শৈলীর মিলন ঘটে। ফলে এসব গির্জা, মঠ প্রভৃতি দেখতে অপূর্ব হয়।

সেণ্ট সোফিয়ার গীর্জা ঃ জাস্টিনিয়ান সেণ্ট সোফিয়া নাম দিয়ে এক অপূর্ব গির্জা তৈরী করান। দশ হাজার লোক পাঁচ বছর পরিশ্রম

করে এই গির্জা তৈরী করে। তার ভেতরের সাজসজ্জা ছিল অপূর্ব — দেওয়ালে দেওয়ালে মার্বেল পাথর খোদাই করা সব অপূর্ব ছবি। দেড় হাজার ফুট ওপরে ছিল গির্জার বিশাল গম্বুজ। এই গির্জা আজও বর্তমান আছে।

বড় বড় মঠ নির্মাণ: বাইজানটাই-সভ্যতার কালে অনেক বড় বড় মঠও তৈরী হয়। মঠগুলির দেওয়ালে যে সব ছবি আঁকা হয়, চিত্রকলার দিক থেকে তা সত্যই অপূর্ব। এবিষয়ে মাউন্ট এথোসের মঠের কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্মৃতি সৌধ দুর্গ ও স্নানাগার নির্মাণেঃ এসব ছাড়াও বাইজান্টিয়াম সম্রাটেরা অনেক স্মৃতিসৌধ, দুর্গ ও স্নানাগার তৈরী করে গেছেন।

চিত্রকলা: মঠের ও গির্জা প্রভৃতির দেওয়ালের চিত্রকলার কথা তোমাদের বলা হয়েছে। বই-এর মধ্যেও এই সময়কার লোক খুবই সুন্দর সুন্দর ছবি এঁকে গেছেন। এই চিত্রকলার প্রভাব ইউরোপের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে পড়ে।

কুটির শিল্পের উন্নতি: জাস্টিনিয়ানের চীনদেশ থেকে গুটিপোকা আনানোর পর বাইজান্টিয়ামের লোকেরা সিল্কের কাপড় তৈরী করায় খুব নিপুণ হয়ে ওঠে। আধুনিককালে আমাদের দেশে কিছু কিছু শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিয়েছে। কিন্তু তোমরা জেনে আশ্চর্য হবে যে ১৪০০/১৫০০ বছর আগে বাইজান্টিয়ামে রাষ্ট্র সিল্ক শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। এছাড়া গয়না তৈরীর কাজে, হাতির দাঁতের কাজে, নানারকম এনামেল ও কাচের জিনিস তৈরীর কাজেও ঐ সময়ের লোকেরা খুব উন্নতি করে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা: জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় ও বাইজান্টিয়ামের লোকেরা অগ্রণী ছিল। সম্রাটেরা এই কাজে খুব উৎসাহ দিতেন। অনেকে নিজেরাও নানা ধরনের বই লিখে গেছেন। পণ্ডিতেরা গ্রীক সাহিত্য, চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি চর্চা করতেন। পুরানো ও অনেক গ্রীক বই এই সময় নকল করা হয়। এই বই নকলের কাজ করা না হলে গ্রীক সাহিত্যের অনেক রত্ন আমাদের কাছে এসে পৌছাতো না।

গ্রীক ভাষার চর্চা: রোমের আধিপত্যে যে খ্রীষ্টান চার্চ গড়ে উঠে তাকে সাধারণভাবে আমরা রোমান চার্চ বলতে পারি। বাইজান্টিয়ামে সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষণে গ্রীক চার্চ জন্ম নেয়। দুই চার্চই

খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী। কিন্তু গ্রীক চার্চে পশ্চিমের চাইতে গ্রীস ও প্রাচ্য ধ্যান-ধারণার প্রাধান্য ছিল বেশী। যেমন, গ্রীক চার্চ যীশু মেরী এদের মূর্তি গড়ে পূজো করার বিরোধী ছিল না। এছাড়া গ্রীক চার্চে সন্ন্যাস ধর্ম বেশী গুরুত্ব পেতে থাকে। যদিও আজ গ্রীক চার্চ অপেক্ষা রোমান চার্চের অনুসরণকারীর সংখ্যা বেশী তবুও গ্রীক চার্চ আজও তার অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে।

বাইজানটিয়াম রাজসভার জাঁকজমক: বাইজান্টিয়াম রাজপ্রাসাদের জাঁকজমক তখনকার দিনে পৃথিবীতে প্রবাদের মত ছিল। রাজার প্রাসাদে সোনার গাছ, মণিমুক্তা দিয়ে তৈরী ফুল, ফল, সোনার পাত ইত্যাদির কথা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। রাজপ্রাসাদের ওপরে ছিল যন্ত্রে চালিত এক বড় ঘড়ি। রাজকর্মচারীরা সব নানারকম কারুকার্য করা দামী পোষাক পরে প্রাসাদে উপস্থিত থাকতেন। এশিয়া মাইনর ও আর্মেনিয়ার গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী সৈনিকেরা সব সময় প্রাসাদ পাহারা দিত। রাজসভার-আদব কায়দা ছিল অতিরিক্ত। ঐসব আদব-কায়দা সম্রাট-সম্রাজ্ঞী থেকে আরম্ভ করে পাইক-বরকন্দাজ সবাই মেনে চলত। পৃথিবীর অনেক রাজসভা বাইজান্টিয়াম রাজসভার জাঁকজমকের অনুকরণ করেছিল।

বাইজান্টিয়াম সভ্যতার পতন: নষ্ট হতে হতে বাইজানটিয়াম সাম্রাজ্য প্রায় এক হাজার বছর স্থায়ী হয়। অতিরিক্ত টাকা-পয়সা সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ। এছাড়া ধনীরা অত্যন্ত বিলাসী হয়ে পড়ে। তাদের বিলাসের জিনিসপত্র যোগাতে দেশের সোনা বিদেশে পাঠাতে হত। সামন্ত রাজাদের মধ্যে সম্রাট হবার জন্য ঝগড়াঝাটি লেগে থাকত। লোকেদের মধ্যে কোন দেশ প্রেম ছিল না। টাকা দিয়ে বিদেশী সৈন্য রেখে দেশরক্ষা করতে হত। এছাড়া বিদেশী আক্রমণ ত লেগেই থাকত। এসব কারণে সাম্রাজ্যের আয়তন ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে। সপ্তম শতাব্দীতে সিরিয়া ও মিশর স্বাধীন হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের আয়তন রাজধানী কন্সটান্টিনোপল ও তার আশপাশের কয়েকটি জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্য জয় করে কন্সটান্টিনোপলে ইসলামের আধিপত্য স্থাপন করেন।

বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের পতনের গুরুত্ব: বাইজান্টিয়াম

সাম্রাজ্যের পতনের বছর থেকে ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা ধরা হয়। কন্স্টান্টিনোপল মুসলমানদের অধীনে চলে যাওয়ার পর সেখানকার পণ্ডিত, কলাবিদ্ প্রভৃতি সকলে পালিয়ে ইউরোপের নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে সভ্যতার বার্তা ইউরোপের দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

উত্তর করে শেখো

১। সভ্যতার বিকাশের মূল কারণ কি কি?

২। জাস্টিনিয়ান সম্রাট হয়ে কিভাবে সাম্রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করার চেষ্টা করেছিলেন?

৩। বাইজান্টিয়ান সাম্রাজ্যের পতনের কারণ লেখ।

৪। বাইজান্টিয়াম সভ্যতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়কে ভিত্তি করে একটি রচনা লেখ।

(ক) ঘরবাড়ী তৈরীর শিল্প, (খ) চিত্রকলা, (গ) কুটির শিল্প, (ঘ) রাজসভার জাঁকজমক।

ত্রয়োদশ পাঠ
ইসলাম ধর্মের জন্ম

আরবদেশ: বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও ইসলাম—পৃথিবীতে এই তিন ধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা বেশী। এর মধ্যে ইসলামধর্ম আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেছিল। আরবদেশ আমাদের দেশের উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত। ভারতবর্ষ থেকে ঐ দেশ খুব দূরে নয়। ওর আয়তন ভারতবর্ষের প্রায় সমান।

কিন্তু আয়তনে বড় হলেও দেশের প্রায় সবটাই মরুভূমি। কাজেই লোকসংখ্যা খুব বেশী নয়। এই দেশের দক্ষিণ ও উত্তরভাগে সামান্য উর্বর জমি আছে। মরুভূমির মধ্যে মধ্যে রয়েছে দু-একটা মরুদ্যান।

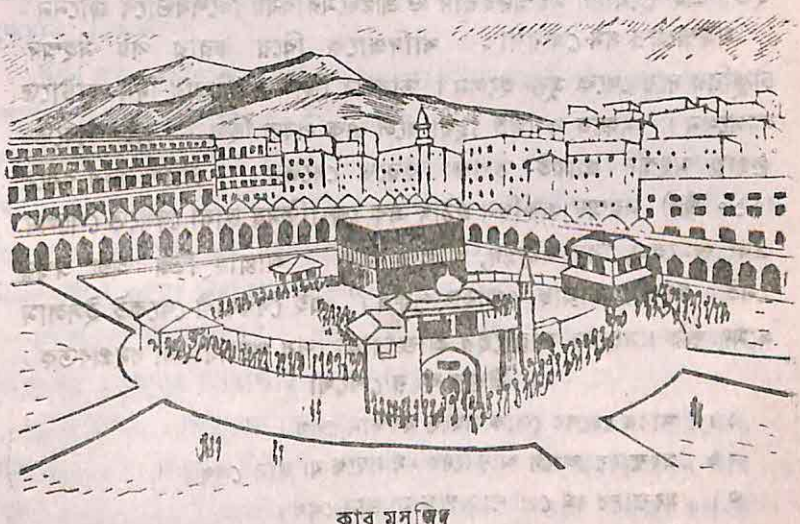
প্রাচীন বা মধ্য যুগের কোন সভ্যতার প্রভাবই আরব দেশে পড়েনি। আরবরা নিজেদের মতে স্বাধীনভাবেই জীবন কাটাচ্ছিল। তবে মিশর, প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য আরবের কোন কোন জায়গার ভেতর দিয়ে চলত। বাণিজ্যের খাতিরে কিছু কিছু ইহুদি আরবে বসবাস করতে শুরু করে।

আরব দেশের লোক ঃ আরব দেশের লোকেদের সাধারণতঃ হু'ভাগে ভাগ করা চলে—স্থিতিশীল ও বেদুইন। স্থিতিশীলরা সাধারণতঃ সহরে বাস করত। বেদুইনরা ছিল যাযাবর—তারা তাদের স্ত্রী-পুত্র, উট ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতি নিয়ে এক জায়গা থেকে আর জায়গায় ঘুরে বেড়াত—সুযোগ পেলে তারা লুঠতরাজও চালাত।

জীবিকা : ভাল চাষবাস হত না বলে, ভেড়া ও উট পালন ছিল আরবদের প্রধান জীবিকা। ব্যবসা-বাণিজ্যেও আরবেরা লিপ্ত থাকত। আরবেরা ব্যবসায়ের জিনিষপত্র উটের পিঠে চাপিয়ে এক মরূদ্যান থেকে অপর মরূদ্যানে যাতায়াত করত।

সামাজিক জীবন : আরবেরা গোষ্ঠীতে (tribe) ভাগ হয়ে বসবাস করত। প্রত্যেক গোষ্ঠীর একজন নায়ক ছিলেন। তাকে "পেপ" বলা হ'ত। গোষ্ঠীর মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বেসর্বা। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সব সময় ঝগড়া লেগে থাকত। গোষ্ঠী আবার ছোট ছোট পরিবারে বিভক্ত থাকত।

আরব জাতির ধর্ম ঃ আরবেরা সাধারণতঃ দেব দেবীর পূজো করত। দেবতাদের মধ্যে আল্লাহ্, হুবাল, লাত প্রভৃতি দেবতার নাম আমরা পাই। দেবতাদের মধ্যে আল্লাহ ছিলেন প্রধান। প্রত্যেক



কাব মসজিদ

পরিবারেরই একজন করে বাস্তু দেবতা থাকতেন। যুদ্ধ আর লুঠতরাজে যাওয়ার আগে আরবেরা বাস্তু দেবতার পূজা করে রওয়ানা হত।

আরবেরা আমাদেরই মত তীর্থযাত্রায় বিশ্বাস করত। মক্কা ছিল তাদের প্রধান তীর্থস্থান। মক্কার প্রধান মন্দির ছিল কাবা। এখানে কাল রং এর অনেকগুলি পাথরের দেবতা হিসাবে পূজো হ'ত। এই মন্দিরের পরিচালনার ভার ছিল কোরায়েশ বংশের লোকের ওপর।

মহম্মদের প্রথম জীবন ঃ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদ কোরায়েশ বংশের সন্তান। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে—আজ থেকে প্রায় এক হাজার চারশো বছর আগে মহম্মদ মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ছিল আবদুল্লা মায়ের নাম আমিনা। ছ'বছর বয়সেই তিনি মা বাবাকে হারিয়ে কাকার কাছে অতি দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হন। লেখাপড়া শেখেননি তিনি—মেষপালকের কাজ করেই তাঁর ছোটবেলা কেটেছে।

খাদিজাকে বিবাহ ঃ বড় হয়ে মহম্মদ খাদিজা নামে এক ধনী বিধবার কর্মচারী নিযুক্ত হন। পরে পঁচিশ বছর বয়সে তিনি খাদিজাকে বিয়ে করেন। খাদিজার বয়স তখন চল্লিশ বছর। খাদিজার গর্ভে মহম্মদের এক মেয়ে জন্মায়—নাম ফতিমা।

ব্যবসা সূত্রে ইহুদি ও খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে পরিচয় ঃ খাদিজার কর্মচারী হিসাবে মহম্মদকে বাণিজ্যের খাতিরে অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। এই সুযোগে মহম্মদ ইহুদি ও খ্রীষ্টধর্মের বিষয় বিশেষভাবে জানেন।

মহম্মদের ধর্ম প্রেরণা ঃ খাদিজাকে বিয়ে করার পর মহম্মদ চাকুরির দায় থেকে মুক্ত হলেন। তারপর তিনি ধর্মচিন্তায় দিন কাটাতে লাগলেন। মক্কার কাছেই হিরা বলে এক পর্বত ছিল। এই পর্বতের গুহায় মহম্মদ প্রায়ই তপস্যা করতে যেতেন। চল্লিশ বছর বয়সে (৬১০ খ্রীঃ) মহম্মদ একদিন হঠাৎ এক জ্যোতির্ময় ছায়া দেখতে পেলেন এবং শুনলেন, "বল মহম্মদ, আল্লাহ্ এক। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য ঈশ্বর নেই। মহম্মদ আল্লাহ্ প্রেরিত পুরুষ।" এই দৈববাণী থেকেই ইসলাম ধর্মের শুরু। মহম্মদ আল্লাহের আজ্ঞাবাহী শেষ পয়গম্বর বা ধর্মপ্রবর্তক।

উত্তর করে শেখো

১। আরব দেশের লোক সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। মহম্মদের আগে আরবদের ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। মহম্মদের ধর্ম প্রেরণা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৪। ইসলাম ধর্মের মূল বাণী কি? মহম্মদ কিভাবে সে বাণী পেয়েছিলেন?

চতুর্দশ পাঠ

ইসলাম ধর্ম

মহম্মদের ধর্ম প্রচার : আল্লাহর বাণী পাওয়ার পর থেকেই মহম্মদ সেই বাণী প্রচার করতে থাকেন। এই বাণীই হয় তাঁর ইসলাম ধর্ম। প্রথমে খাদিজা, পরিবারের কয়েকজন লোক, কয়েকটি ক্রীতদাস ও খুব গরীব কয়েকজন লোক ছাড়া আর কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি।

মক্কাবাসীর মহম্মদের প্রতি শত্রুতা : মহম্মদের জ্ঞাতি কোরায়েশ লোকেরাই মহম্মদের শত্রুতা করতে থাকেন বেশী করে। মহম্মদের ধর্ম প্রচারিত হলে কাবার মন্দিরের প্রভাব কমে যাবে এবং তাদের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে—এই ছিল তাদের ভয়। জ্ঞাতিরা মহম্মদকে হত্যা করার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন।

মহম্মদের মদিনা পলায়ন : মদিনায় ছিল মহম্মদের মামার বাড়ী। মদিনার লোকেরা ইসলাম ধর্মের পক্ষপাতি ছিল। তাদের আমন্ত্রণে একদিন রাত্রে মহম্মদ গোপনে মদিনায় পালিয়ে গেলেন। মদিনায় গিয়ে মহম্মদ সেখানকার শাসনকর্তা হলেন।

হিজরা গণনা : ইতিহাসে মহম্মদের মদিনা পলায়ন হিজরৎ নামে খ্যাত। তিনি ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই মদিনা যান। ঐ দিন থেকে মুসলমানরা তাদের সাল বা হিজরা গণনা আরম্ভ করেন। যীশুখ্রীষ্টের জন্ম থেকে যেমন "খ্রীষ্টাব্দ"—মহম্মদের মদিনা পলায়নের দিন থেকে তেমনি "হিজরা"।

মক্কা জয় : মদিনার বেশীর ভাগ লোকই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। তারা হল মহম্মদ "সহায়ক" বা "আনজার"। তাদের সাহায্যে মহম্মদ মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালালেন। হিজরতের দুই বছর পরে মহম্মদ বদর নামে এক জায়গায় মক্কার সৈন্যদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তারপর ৮ই হিজরীতে (মদিনা পলায়নের ৮ বছর পরে, ৬৩০ খ্রীঃ) মহম্মদ মক্কা জয় করেন। ইসলাম ধর্ম মক্কায় প্রচারিত হয়।

মহম্মদের দেহত্যাগ : মক্কা বিজয়ের দু'বছর পরে (১০ হিজরী ৬৩২ খ্রীঃ) মহম্মদ আমাশায় রোগে দেহত্যাগ করেন।

কোরাণ : হিন্দুদের যেমন বেদ, খ্রীষ্টানদের যেমন বাইবেল, মুসলমানদের তেমন কোরাণ প্রধান ধর্মগ্রন্থ। মহম্মদ বলতেন তাঁর মুখ দিয়ে আল্লাহ্ই তাঁর বাণী প্রচার করেছেন। তাই মহম্মদ যখনই যা কিছু বলতেন তাঁর শিষ্যেরা তা মনে রাখতে চেষ্টা করতেন।

তারপর তাঁরা এসব বাণী পাথরের গায়ে, চামড়ার ওপরে, পাতায় লিখে রাখতেন। মহম্মদের প্রথম উত্তরাধিকারী আবুবকরের আদেশে এসব লেখা একত্রিত করা হয়। এইভাবে কোরাণের সৃষ্টি হয়।

ইসলাম ধর্মের সারমর্ম : ১। ইসলাম কথার অর্থ ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। ঈশ্বর বা আল্লাহ এক। তিনি সর্ব শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপাসনা করতে নেই। কোরাণ আল্লাহ্‌র বাণী।

২। আল্লাহর কোন রূপ নেই। মূর্তি গড়ে তাঁর পূজা করা নিষেধ। এমনকি মহম্মদের ছবি রাখাও নিষেধ।

৩। মহম্মদ আল্লাহর আজ্ঞাবাহী শেষ পয়গম্বর বা ধর্ম প্রবর্তক।

৪। প্রত্যেক মুসলমানের পাঁচটি প্রধান কর্তব্য রয়েছে।

(ক) কলমা—প্রত্যেক মুসলমানের ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। প্রয়োজন হলে "জেহাদ" বা যুদ্ধ করেও তা করতে হবে।

(খ) নমাজ—প্রত্যেক মুসলমামকে মক্কার দিকে মুখ করে দিনে পাঁচবার নমাজ পড়তে বা উপাসনা করতে হবে।

(গ) রোজা—রমজান মাসে যখন প্রথম চাঁদ দেখা যাবে, সে সময় থেকে একমাস প্রত্যেক মুসলমানকে দিনের বেলা উপবাস করে থাকতে হবে।

(ঘ) জাকত—দরিদ্রকে ভিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

(ঙ) হজ—সম্ভব হলে জীবনে অন্ততঃ একবার প্রত্যেক মুসলমান মক্কায় তীর্থযাত্রা করবে।

উত্তর করে শেখো

১। বামদিকে কয়েকটি শব্দ ও ডানদিকে করেকটি বাক্যাংশ দেওয়া হল। বামদিকের যে শব্দের সঙ্গে ডানদিকের যে বাক্যাংশের সম্বন্ধ রয়েছে তার ডানদিকের বন্ধনীর ভেতর যথাযথ শব্দের নম্বর বসাও :

শব্দ	ব্যাক্যাংশ
১। হজ ২। হিজরা ৩। কাবা ৪। জাকত ৫। কোরাণ ৬। কলমা ৭। আনজার ৮। বদর ৯। পয়গম্বর।	দরিদ্রকে দান ( ) মুসলমানদের সাল ( ) আল্লাহর বাণী ( ) মক্কার মন্দির ( ) মক্কার তীর্থযাত্রা ( ) বিধর্মীকে মুসলমান করা ( ) সহায়ক ( ) মক্কাবাসীর পরাজয় ( ) আল্লাহ আজ্ঞাবাহী ( )।

২। কোরাণ কিভাবে লেখা হয় ? ______

পঞ্চদশ পাঠ

খলিফাদের শাসন

খলিফা : মহম্মদের মৃত্যুর পর ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর উত্তরাধিকারী কেউ হলেন না। কারণ মহম্মদই শেষ পয়গম্বর। কোরাণে যা লেখা আছে, তাই ইসলাম ধর্মের শেষ কথা।

কিন্তু পার্থিব কাজের জন্য একজন উত্তরাধিকারী প্রয়োজন। সেই উত্তরাধিকারীর নাম হল খলিফা। পৃথিবীতে তিনি মহম্মদের প্রতিনিধি। খলিফার কাজ হল সমাজে নেতার কাজ করা, মুসলমানদের রক্ষা করা আর ইসলামের প্রচার করা। মুসলমানদের মধ্যে বিবাদে খলিফা বিচারকের কাজও করবেন। এক কথায় খলিফা হলেন ইসলামের রক্ষক, প্রচারক ও বিচারক।

প্রথম চার খলিফা : মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর চারজন আত্মীয় পর পর খলিফা হন। এরা মোট ২৯ বছর (৬৩২—৬৬১ খ্রীঃ) শাসন করেন। এই চারজন খলিফা "ধর্মপরায়ণ" খলিফা নামে ইসলামে সম্মানিত।

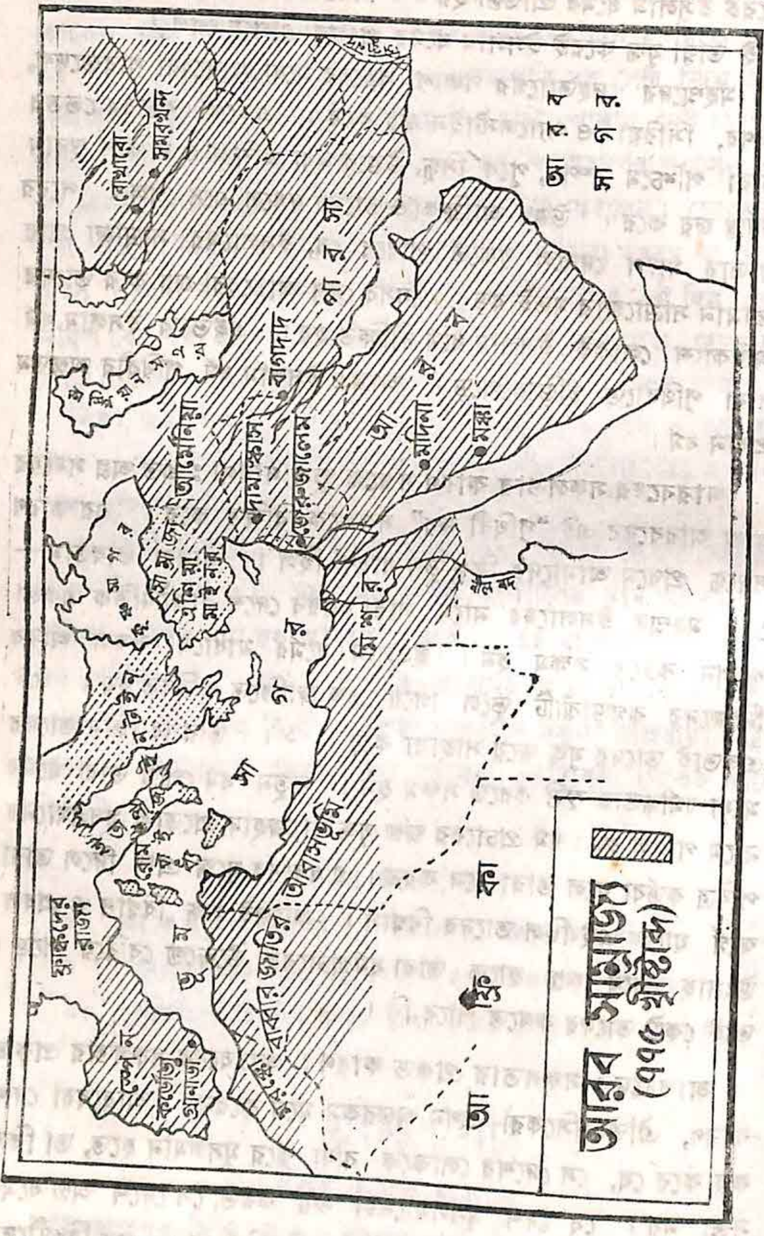
উমাইয়াদ বংশ : চতুর্থ খলিফা আলির মৃত্যুর পর মোয়াবিয়া খলিফা হন। তিনি ছিলেন মহম্মদের প্রিয় শিষ্য। তিনি কোরায়েশ বংশের লোক ছিলেন না। মোয়াবিয়ার বংশের বারজন সন্তান পর পর খলিফা হন। মোয়াবিয়ার প্রতিষ্ঠিত খলিফা বংশের নাম ছিল উমাইয়াদ বংশ। এই বংশের শাসনকাল ছিল মোট ৮৮ বৎসর (৬৬২—৭৫০ খ্রীঃ)। উমাইয়াদ বংশের প্রথম খলিফা মদিনা থেকে রাজধানী দামস্কাসে স্থানান্তরিত করেন।

গৃহযুদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যে দুই দলের সৃষ্টি : খলিফার পদে কে বসবেন এই নিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সুরু হয়। এক দলের মত ছিল কোরয়েশ বংশ থেকেই যেন খলিফা হন। অপর দল তা মানতে রাজী হলেন না। প্রথম দল শিয়া ও দ্বিতীয় দল সুন্নি বলে পরিচিত হন।

এই দুই দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়। চতুর্থ খলিফা আলি শত্রুর চক্রান্তে মারা যান। তারপর সুন্নিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও মোয়াবিয়া খলিফা হন।

শোক দিবস হিসাবে মহরম : মোয়াবিয়ার ছেলে তখন খলিফা।

দিতে হত না। এছাড়া অবশ্য মুসলমান হলে অর্থাৎ রাজার ধর্ম নিলে



বিজিত দেশের লোকেরা স্বভাবতঃই অনেক সুযোগ সুবিধা পেত। এসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করা ও "জিজিয়া" কর এড়ানোর জন্য

অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এছাড়া ইসলাম ধর্মের মধ্যে সাম্যবাদের বীজও রয়েছে। রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, নির্বিশেষে সকল মুসলমানই সমান—এই ছিল ইসলামের নীতি। এ কারণেও তখনকার বৈষম্যমূলক সমাজের অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ধর্মের ভেতর দিয়ে বিজিত দেশের লোকের সমর্থন পাওয়া, দেশ বিজয়ের পথে আরবদের সাহায্য করে।

ইসলামের সাফল্যের আরও কারণ ছিল। বাইজান্টিয়াম ও পারস্য সাম্রাজ্য পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ করে দু'জনই দুর্বল হয়ে পড়ে। উভয় সাম্রাজ্যের শাসক শ্রেণী ও সেনাবাহিনী দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। কুশাসন ও শোষণের চাপে দুই সাম্রাজ্যের প্রজারাই অস্থির হয়ে ওঠে। তাই কোন সাম্রাজ্যের প্রজাসাধারণ আরবদের বিজয়ে বাধা দেয় নি। উচ্ছৃঙ্খল, নীতিহীন, বিলাসী, ভাড়া করা সৈন্য বাহিনীকে পরাজিত করতে পারলেই আরবদের দেশ জয়ে আর কোন বাধা থাকত না।

কন্সটান্টি-নাপলেরকাছে আরবদের বিজয় অভিযান প্রতিহত : পূর্ব দিকে আরবেরা কন্সটান্টিনোপল পর্যন্ত এগিয়ে আর এগুতে পারেনি। কন্সটান্টিনোপলকে অবরোধ করে রাখলেও এর দুর্গ ভেদ করে আরবেরা নগরের ভেতরে ঢুকতে পারে নি। জলপথেও তাদের কন্সটান্টিনোপলে ঢোকার চেষ্টা বিফল হয়। শেষে ৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান্টিয়াম সম্রাট লিওর কাছে আরবেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। এই ব্যর্থতার ফলে পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপ আরবদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পায়। না হলে পৃথিবীর ইতিহাস হয়ত বা অন্য রকম হয়ে যেত।

ফ্রান্সে আরবদের গতিরুদ্ধ : পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপের মত পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপও আরবদের আক্রমণের মুখে পড়ে। আরবরা আফ্রিকা থেকে স্পেনে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সে দেশ জয় করে। তারপর তারা উত্তর দিকে ফ্রান্সের ভেতর ঢুকে পড়ে। কিন্তু ফ্রাঙ্কবীর চার্লস মার্টেল-এর হাতে তারা তুর-এর যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হয় (৭৩২ খ্রীঃ)। এ যুদ্ধের ফলও পৃথিবীর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ—উত্তর ও মধ্য ইউরোপ আরব আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

———

সপ্তদশ পাঠ

স্পেনে মুসলমান সভ্যতা

স্পেনে মুসলমান রাজত্ব: অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা স্পেন জয় করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তারা স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়। কাজেই স্পেনে তারা প্রায় পাঁচশো বছর রাজত্ব করে।

স্পেনে আরবদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। রাজ্যের অধিকাংশ লোকই ইসলামে দীক্ষিত। গথ ও আফ্রিকার মূর জাতির লোক মুসলমান। প্রথমে স্পেনের আরব শাসকদের উপাধি ছিল আমীর। পরে তাঁরা খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন।

পরধর্মের প্রতি উদার আচরণ: পরধর্মের প্রতি স্পেনের মুসলমানদের আচরণ উদার। তাঁরা কোথাও কোনো গির্জ্জা করেননি, কাউকে জোর করে মুসলমান করেননি। তাঁদের স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ধর্মের লোকেরাই পড়াশুনা করত।

স্পেনের মুসলমান রাজ্যের প্রতি ইউরোপের লোকের দৃষ্টিভঙ্গী: তৃতীয় আবদুর রহমান স্পেনের খুব নামকরা শাসকছিলেন। তিনিই প্রথম খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন। জানতে পারা যায় যে, তাঁর রাজসভায় বাইজান্টাইন, জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী রাজপুত্ররা উপস্থিত থাকতেন। ইউরোপের সকল জায়গা থেকেই ছাত্রেরা স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে নানা বিষয় পড়তে আসত। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে তখনকার ইউরোপের লোকের চোখে স্পেনের মুসলমান রাজ্যের স্থান খুব উঁচুতে ছিল।

কর্ডোভা: স্পেনের মুসলমান রাজ্যের রাজধানী ছিল কর্ডোভা। কর্ডোভা নগর সব দিক দিয়েই খুব উন্নত। লণ্ডন ও প্যারিসের পথ যখন বর্ষায় কাদা মাখামাখি থাকত ও রাতে অন্ধকার বিরাজ করত, তখন কর্ডোভার পাথর দিয়ে তৈরী পথ আলোকমালায় উজ্জ্বল। কর্ডোভায় দশলক্ষ লোক বাস করত। সেখানে ছিল, সাতশো মসজিদ, তিনশো স্নানাগার, সত্তরটি গ্রন্থাগার, অসংখ্য বই-এর দোকান ও অনেক বড় বড় কোঠাবাড়ী। কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় তখন পৃথিবী বিখ্যাত—ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে বহু লোক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসত।

স্পেনে মুসলমান সভ্যতা: ওপরের কর্ডোভার বিবরণ থেকে বুঝতে পার, স্পেনের মুসলমানরা কত উঁচু দরের ছিল। স্থাপত্য শিল্পে

(ঘর বাড়ী তৈরী করার কৌশল) মুসলমান স্পেন ইউরোপে অগ্রণী। ঐ সময়কার তৈরী কিছু কিছু মসজিদ, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি এখনও বর্তমান রয়েছে। এ বিষয়ে আমরা কর্ডোভার মসজিদ ও গ্রানাডার রাজপ্রাসাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। মুসলমান স্পেনে বহু অবৈতনিক স্কুল ছিল। তাতে জনসাধারণ লেখাপড়া শিখতে পারত। কাব্য, ইতিহাস, চিকিৎসা, গণিত প্রভৃতি বিষয় ইউরোপের অনেকে স্পেনে এসে শিক্ষা নিত।

উত্তর করে দেখো

১। স্পেনে মুসলমানদের রাজত্বকাল কত বছর ছিল? স্পেনের মুসলমানেরা পরধর্মের লোকের প্রতি কেমন আচরণ করতেন?

২। স্পেনের মুসলমান রাজ্যের প্রতি ইউরোপের লোকের কেমন মনোভাব ছিল প্রমাণ সহ ব্যাখ্যা কর।

৩। স্পেনে মুসলমান সভ্যতার বিবরণ দাও। এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে কর্ডোভার কথা উল্লেখ করবে।

অষ্টাদশ পাঠ

মুসলমান সভ্যতা

আরবদের সভ্যতা না বলে মুসলমান সভ্যতা বলার কারণ: এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ নিয়ে আরবেরা এক উঁচুদরের সভ্যতা গড়ে তোলে। এই সভ্যতা গড়ার কাজে আরবেরা নেতৃত্ব দিয়েছে সত্য, কিন্তু যাদের প্রতিভা ও পরিশ্রমে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে, তাদের অনেকেই আরবদেশীয় ছিল না। অবশ্য তারা প্রায় সকলেই মুসলমান ছিল।

পূর্বের সভ্যতা থেকে মুসলমান সভ্যতার সাহায্য লাভ: আরবেরা যে সব দেশ জয় করে, তাদের মধ্যেই অনেক দেশেই উন্নত সভ্যতা বর্তমান ছিল। ইউরোপের বারবেরিয়ানদের মত তারা ঐ সব দেশের সভ্যতা ধ্বংস করেনি। ওদের কাছ থেকে গ্রহণ করে নিজেদের সভ্যতাকে উন্নত করে। গ্রীক, পারসীক, ইহুদী ও ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে নিজেদের বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা মিশিয়ে মুসলমানেরা নতুন সভ্যতা গড়ে তোলে।

মুসলমানদের শিল্প : নীচের শিল্পগুলিতে মুসলমানদের বিশেষ দক্ষতা দেখা যায়—সুন্দর সুন্দর থালা বাসন তৈরী করা, লোহা দিয়ে তলোয়ার ও নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা ; পেতলের সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরী করা : কারপেট ও সিল্কের কাপড় তৈরী করা ; চামড়ার জিনিসপত্র তৈরী করা ; কাগজ তৈরী করা ইত্যাদি।

ব্যবসা বাণিজ্য : স্থল ও জলপথে মুসলমানেরা পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সঙ্গেই বাণিজ্যে লিপ্ত হত। চীন, সিংহল, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে তাদের বাণিজ্য বিস্তৃত। রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি ইউরোপের অনেক দেশেই মুসলমান বণিকেরা বাণিজ্য করতে যেতেন। পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গেও মুসলমানদের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল।

চাষ-বাসের উন্নতি : মিশরের কাছ থেকে সেচের কৌশল মুসলমানেরা শিখে নেয়। আর তার সদ্ব্যবহার করে তারা খুব উন্নত হয়ে ওঠে। ফলে যেখানে ফসল ফলত না সেখানেও ফসল ফলতে আরম্ভ করে—যেখানে লোকজন ছিল না সেখানে কৃষির দৌলতে লোকজনে পূর্ণ হয়ে যায়।

জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা : মুসলমানেরা জ্ঞান বিজ্ঞানের ভক্ত। প্রত্যেক মস্‌জিদেই লেখাপড়া শেখান হত। মুসলমানেরা যে বড় বড় গ্রন্থাগার স্থাপন করে তা আগেই বলা হয়েছে। তারা বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করে। তার মধ্যে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত। ১২,০০০ ছাত্র সেখানে পড়াশুনা করত। কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তোমাদের আগেই বলা হয়েছে।

গ্রীক ও ভারতীয়দের কাছে শিখে মুসলমানেরা জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, গণিত, বীজগণিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রে খুব উন্নতি লাভ করে। বিশেষ করে অঙ্কের রাশি ও দশমিক ভগ্নাংশ ভারতবর্ষ থেকে শিখে ইউরোপকে তারা শেখায়। মুসলমানেরা নিজেদের গবেষণার দ্বারাই চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি ঘটায়।

রসায়ন বিদ্যার জন্ম : অন্য ধাতুকে কি করে সোনা বা রূপায় রূপান্তরিত করা যায় আর কি করে মানুষের যৌবন চিরদিন ধরে রাখা যায়, মুসলমান বিজ্ঞানীরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। এই অনুসন্ধানের ফলে তাঁরা বেশ কয়েকটি রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কার করেন—জন্ম নেয় আধুনিক রসায়ন বিদ্যা।

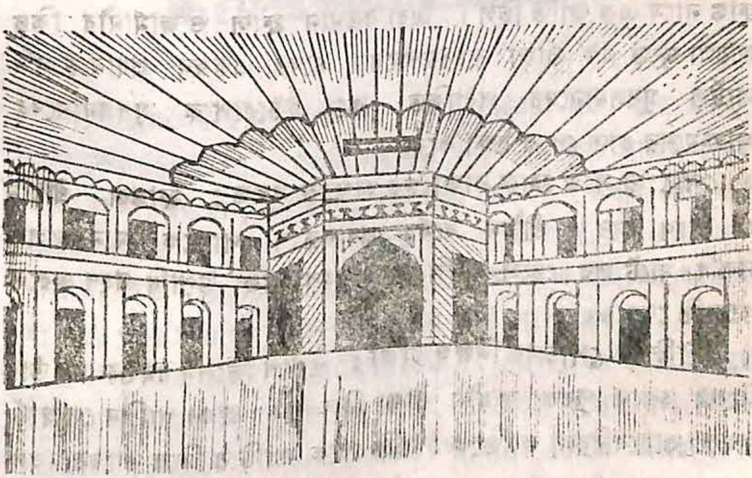
ভূগোল, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও জীবন চরিত রচনায় মুসলমান প্রতিভা : মুসলমানদের মধ্যে ভূগোলের চর্চা খুব বেশী



ডোম অফ দি রক (জেরুজালেমে মহম্মদের স্মৃতি গম্বুজ)

ছিল। কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস ও জীবনচরিত রচনায় অনেক মুসলমান মনীষী বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

মুসলমান স্থাপত্য শিল্প : স্পেনে মুসলমানদের স্থাপত্য শিল্পের কথা আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া সাম্রাজ্যের প্রায় সব দেশেই তারা



ওমরের মসজিদের অভ্যন্তর

বড় বড় মসজিদ ও প্রাসাদ তৈরী করে। এর মধ্যে খলিফা ওমরের

তৈরী মসজিদ ও জেরুজালেমে মহম্মদের স্মৃতিগম্বুজের নাম করা যেতে পারে।

উত্তর করে শেখো

১। আরব সভ্যতা না বলে মুসলমান সভ্যতা বলার কারণ কি?

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর নির্ভর করে মুসলমান সভ্যতার উপর একটি রচনা লেখ—(ক) শিল্প (খ) ব্যবসা বাণিজ্য (গ) জ্ঞান বিজ্ঞান (ঘ) স্থাপত্য শিল্প (ঙ) ভূগোল, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতিতে মুসলমান প্রতিভা।

উনবিংশ পাঠ

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য গঠন

ফ্রাঙ্কদের রাজ্য : বারবেরিয়ানরা কি করে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসে করে তা তোমরা পড়েছ। বিজয়ী বারবেরিয়ানরা বিজিত রোমানদের সভ্যতা নিয়ে কি করে রোমান সাম্রাজ্যের পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়াল, তাই এখন তোমরা পড়বে। রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর বারবেরিয়ানদের বিভিন্ন জাতি ইউরোপে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে একথাও তোমাদের বলা হয়েছে। বারবেরিয়ানদের মধ্যে ফ্রাঙ্ক নামে এক জাতি ছিল। এরা বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানীর কিছু জায়গা জুড়ে এক রাজ্য স্থাপন করে। এদের একজন প্রধান চার্লস মার্টেল মুসলমানদের পরাজিত করে ইউরোপকে মুসলমানদের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন।

পোপের সঙ্গে ফ্রাঙ্ক রাজাদের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ : ফ্রাঙ্করা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। খ্রীষ্টান ধর্মের প্রধানরূপে পোপকে মেনে চলে। চার্লস মার্টেলের ছেলে, পাপিনকে পোপ 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করতে অনুমতি দেন।

ইটালিতে পোপের নিজস্ব রাজ্য : পোপ ছিলেন ধর্মগুরু। তাঁর নিজের কোন পৃথক স্বাধীন রাজ্য ছিল না। রাজা পাপিন লোম্বার্ড নামক বারবেরিয়ান জাতিকে ইটালি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের দখল করা জায়গা পোপকে দেন। তখন থেকেই পোপ নিজস্ব স্বাধীন ভূমিখণ্ডে বাস করতে আরম্ভ করেন। এ ব্যবস্থা আজও চলছে।

শার্লমেনের সিংহাসন লাভঃ পাপিন মারাযাওয়ার পর ফ্রাঙ্কদের নিয়ম অনুসারে তাঁর দু'ছেলেই ভাগাভাগী করে ফ্রাঙ্ক রাজ্যের রাজা হন। অল্পদিনের মধ্যেই ভাইয়ের মৃত্যু হলে শার্লামেন ফ্রাঙ্ক রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হলেন।

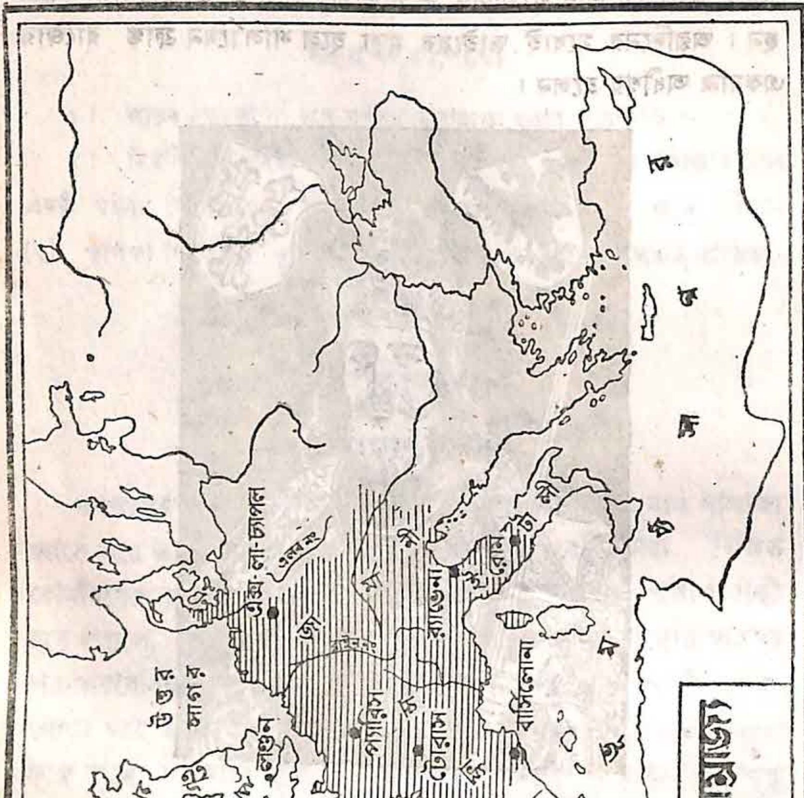


শার্লামেন

শার্লামেনের রাজ্য বিস্তারঃ শার্লামেনের মত বীর মধ্যযুগে আর কেউ ছিলেন না। তিনি সবশুদ্ধ তেতাল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। তার মধ্যে অন্ততঃ তিপান্নবার যুদ্ধ যাত্রা করেন। অর্থাৎ গড়ে প্রতি বছরই একটির বেশী যুদ্ধ তিনি করতেন। ফলে শার্লামেন এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। বর্তমান ফ্রান্স, জার্মান ও ইটালির অধিকার যা নিয়ে তাঁর সাম্রাজ্য ছিল—পর পৃষ্ঠায় সেই ম্যাপ দেখ।

পোপ লিও রোম থেকে বিতাড়িতঃ শার্লামেন যখন ফ্রাঙ্কদের রাজা, রোমে তখন পোপ ছিলেন লিও। কটুভাষী বলে পোপ লিওকে অনেকেই অপছন্দ করত। তখন আবার রোমে বসবাসকারী বারবেরিয়ানদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টান নয়। এই অখ্রীষ্টানরা একবার

লিওর উপর রেগে গিয়ে তাঁর জিহ্বার প্রথম দিক্‌টা কেটে তাঁকে রোম থেকে তাড়িয়ে দেয়।



লিওর শার্লামেনের স্মরণঃ আর কোন উপায় না দেখে লিও তখনকার সবচাইতে শক্তিশালী খ্রীষ্টান ও পোপের প্রতি সহানুভূতিশীল রাজা শার্লামেনের স্মরণাপন্ন হন। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শার্লামেন সসৈন্যে রোমে উপস্থিত হয়ে অখ্রীষ্টানদের শাসন করে লিওকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা : রোমের বিখ্যাত গির্জা সেন্ট পিটার। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টের জন্মদিনে (২৫শে ডিসেম্বর) সেন্ট পিটারের গির্জায় উৎসব চলছে। শার্লামেন নতজানু হয়ে প্রার্থনা



শার্লামেনের রাজ্য অভিষেক

করছেন। এমন সময় পোপ লিও তার মাথায় প্রাচীন রোমান সম্রাটের এক সোনার মুকুট পরিয়ে দিলেন। তারপর পোপ তাঁকে রোমান সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। পোপকে খ্রীষ্টানরা ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করত। তাই জনগণ শার্লামেনকে ভগবানের প্রতিনিধির অভিষিক্ত সম্রাট বলে গ্রহণ করে। সে আজ প্রায় বারশো বছরের আগের কথা।

উত্তর করে শেখো

১। পোপ কিভাবে স্বাধীন ভূখণ্ডে বাস করেন ?
২। পোপ লিও কিভাবে রোম থেকে বিতাড়িত হন ?
৩। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় কিভাবে ?

বিংশ পাঠ

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনের ফল

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যঃ শার্লামেনের স্থাপিত সাম্রাজ্যকে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য (Holy Roman Empire) নাম দেওয়া হয়। অখ্রীষ্টান বারবেরিয়ানরা রোমান সাম্রাজ্য জয় করে। তাই খ্রীষ্টানদের চোখে তা "অপবিত্র" (unholy) হয়ে যায়। খ্রীষ্টান রাজা এবং পোপের পৃষ্ঠপোষক শার্লামেনকে রোমের সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে তাঁর সাম্রাজ্য আর অপবিত্র থাকে না। তাই, শার্লামেনের স্থাপিত রোমান সাম্রাজ্য পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য বলে ঘোষিত হয়।

ইতিহাসে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনের গুরুত্বঃ রোমান সভ্যতার পতনের পর বারবেরিয়ানদের ওপর দায়িত্ব পড়ে ইউরোপের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু তাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছিল না যতদিন পর্যন্ত তারা রোমান সভ্যতা ও খ্রীষ্টান ধর্ম মনে প্রাণে গ্রহণ না করছে। কারণ ভবিষ্যত সভ্যতা গড়ে উঠবে রোমান সভ্যতার অনুসরণে ও খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভাবের ভেতর দিয়ে। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনের ভেতর দিয়ে দুটো জিনিষের গোড়াপত্তন হয়। এই সর্বপ্রথম রোমান ছাড়া একজন বারবেরিয়ানকে রোমান সম্রাট বলে স্বীকার করা হয়। রোমানদের যে বারবেরিয়ানদের সম্বন্ধে বিরূপতার ভাব ছিল তা দূর হয়। বারবেরিয়ানরা এর পরে রোমান সভ্যতা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারে। কারণ তাদেরই একজন রোমান সম্রাট হয়েছেন—রোমের সভ্যতার ধারক ও বাহক হয়েছেন। খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু একজন বারবেরিয়ানকে নিজের হাতে মুকুট পরিয়ে প্রথম রোমান সম্রাটরূপে ঘোষণা করলেন। এতে খ্রীষ্টান ধর্মের সঙ্গে বারবেরিয়ানদের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হল। একজন বারবেরিয়ান হলেন খ্রীষ্টধর্মের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। ফলে বারবেরিয়ানদের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ দ্রুততর হ'ল।

যে রোমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হল, তার প্রতাপ তেমন না থাকলেও অন্ততঃ নামে তা এক হাজার বছর স্থায়ী হয়। ফলে এই সাম্রাজ্য বারবেরিয়ানদের একসূত্রে গাঁথতে সাহায্য করে। পোপের রোমান সম্রাটের মাথায় মুকুট পরিয়ে দেওয়ায় সম্রাট দাবী করতে লাগলেন যে, তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যশাসন করছেন। পোপ মাথায় মুকুট পরিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেছেন। পরে আমরা দেখব, সম্রাট ছাড়াও ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাজারাও এ দাবী

করতে লাগলেন—তাঁরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। কাজেই প্রজাদের তাঁদের সমালোচনা করার অধিকার বা তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার নেই। ইউরোপের ইতিহাসে রাজায় প্রজায় দ্বন্দ্বের সূত্রপাত অনেকটা এ ধারণা থেকেই হয়। পোপ ও সম্রাট বা রাজাদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাতও শার্লামেনের সম্রাট হওয়ার ঘটনা থেকে শুরু হয়। প্রশ্ন দাঁড়াল দুজনের মধ্যে কে বড়? পোপ সম্রাটকে সম্রাট করেছেন (মাথায় মুকুট পরিয়ে) তাই তিনি বড়। অপর দিকে সম্রাটই পোপকে রক্ষা করেছেন তাঁকে নিজ স্থান ফিরিয়ে দিয়েছেন—তিনি ধর্মের রক্ষক; তাই তিনি বড়। এ বিবাদ ইউরোপের ইতিহাসে অনেক দিন ধরে চলে।

নবজাগরণের সূত্রপাত: পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য গঠনের ফল প্রায় হাতে হাতেই ফলতে আরম্ভ করল। যে বারবেরিয়ানরা লেখাপড়ার ধার ধারত না, তারা লেখাপড়ায় এগিয়ে আসতে লাগল। নতুন নতুন স্কুল স্থাপিত হল। ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার চর্চা আরম্ভ হল। ইতিহাস, দর্শন, জীবনী প্রভৃতি নিয়ে বই লেখা সুরু হল। খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক বই লেখা হল—কাব্যও রচিত হল। জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো এসে তাদের নতুন জীবনের সূত্রপাত ঘটাল।

নবজাগরণে শার্লামেনের অবদান: শার্লামেন নিজে লেখাপড়া জানতেন না বটে, কিন্তু পরবর্তী জীবনে তিনি নিজের চেষ্টায় ল্যাটিন ভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন ও গ্রীকভাষা বুঝতেন। তাঁর নিজের ভাষা অবশ্য জার্মান ছিল। নিজে নিরক্ষর হলেও শার্লামেন সারাজীবন শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে গেছেন। তিনি রাজপ্রাসাদে এক স্কুল স্থাপন করেন। বুদ্ধিমান ছেলে হলেই সে স্কুলে পড়ার সুযোগ পেত। গির্জাগুলি যাতে স্কুলরূপেও কাজ করে সেদিকে তিনি দৃষ্টি রাখতেন। ফলে বারবেরিয়ানরা ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার চর্চা উৎসাহের সঙ্গে সুরু করে। পুরাতন বইগুলি যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্য তাদের নতুন অনুলিপি তৈরীর ব্যবস্থাও শার্লামেন করেন। সম্রাট তাঁর নিজের চারিদিকে পণ্ডিতদের এক সভা গড়ে তোলেন। ঐ সভায় দার্শনিক, ঐতিহাসিক, কবি, ধর্মগ্রন্থ প্রণেতা প্রভৃতি সকল বিষয়ে পণ্ডিত লোকই ছিলেন।

শার্লামেনের সময়ের মাত্র কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম ও তাঁদের পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্র নীচে দেওয়া হল :

১। আইন হার্ড—শার্লামেনের জীবনী লেখক, ২। আলকুনি—বিখ্যাত পণ্ডিত ও লেখাপড়ার ব্যাপারে শার্লামেনের পরামর্শদাতা, ৩। জন স্কট—দার্শনিক, ৪। স্ট্রেবো—কবি, ৫। স্টেরাস—ধর্ম বিষয়ে লেখক ও কবি।

উত্তর করে শেখো

১। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। নবজাগরণে শার্লামেনের অবদান কি তা বল।

৩। শার্লামেনের সময়কার বিখ্যাত কয়েকজন পণ্ডিতের নাম বল।

একবিংশ পাঠ

খ্রীষ্টান ধর্মে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়

ত্যাগ মানুষের স্বভাবজাত ব্রত : পৃথিবীতে সকল যুগের সকল সভ্য মানুষের মধ্যেই কেউ না কেউ ত্যাগ ব্রত গ্রহণ করেছেন। মানুষ ত্যাগে আনন্দ পায়। ত্যাগের প্রতি তার স্বভাবজাত আকর্ষণ। যাঁরা সংসারের অর্থ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের স্মরণ নেন আমাদের দেশে তাঁদের সন্ন্যাসী বলে। তাই সন্ন্যাসীদের আমাদের দেশে সব সময়ই উচ্চ সম্মান দিয়ে আসা হয়েছে।

খ্রীষ্টানদের মধ্যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি : প্রথম দিকে খ্রীষ্টানদের রোমান সম্রাট ও জনসাধারণের কাছ থেকে প্রচুর অত্যাচার সহ্য করতে হয়। কিন্তু পরে রোমান সম্রাট খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন ও ইউরোপের অধিকাংশ লোক এই ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়ে। ফলে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকদের হাতে প্রচুর অর্থ এসে পড়ল। অনেক ভক্তই টাকা পয়সা ও জায়গা জমি চার্চকে দান করতে লাগল। সেইজন্য ধর্মযাজকদের মধ্যে বিলাসিতা ঢুকল। তাঁদের মধ্যে অনেকে বিলাসী জমিদারের মতই জীবন কাটাতে লাগলেন।

তোমাদের আগেই বলা হয়েছে ত্যাগের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে। অনেক ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান ধর্মযাজক এইরকম বিলাসিতা পছন্দ করলেন না। ধর্মের যাঁরা ধারক ও বাহক তাঁদের কঠোর সংযমের মধ্যে জীবন কাটাতে হবে। প্রাচ্যদেশে সন্ন্যাসীদের জীবনধারাও তাঁদের প্রভাবিত করল। তাই তাঁদের অনেকে সংসার ছেড়ে মঠে কাজ করতে লাগলেন। তাঁরা সব রকম সংসার সুখ ছেড়ে কঠোর সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে লাগলেন। এভাবে খ্রীষ্টান ধর্মে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। সে প্রায় ১৭০০/১৮০০ বছরের আগের কথা।

বেনেডিক্টের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ঃ নানা কারণে প্রথমদিকে খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেন নি। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে ; অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় তেরোশো বছর আগে, বেনেডিক্ট নামে এক সন্ন্যাসী নতুন এক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। তিনি অভিজাত বংশে জন্মেছিলেন। কিন্তু অল্প বয়সেই সংসার ছেড়ে, নির্জনে দীর্ঘদিন ঈশ্বরের আরাধনা করেন। অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ইটালিতে অপেক্ষাকৃত এক নির্জন জায়গায় তাঁর সম্প্রদায়ের শিষ্যদের থাকবার জন্য এক মঠ তৈরী করেন।

বেনিডেক্ট সম্প্রদায়ের প্রতিজ্ঞাঃ ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে বেনেডিক্ট সন্ন্যাসীরা কিভাবে জীবন কাটাবেন তার জন্য কতকগুলি নিয়ম তৈরী করেন। এই নিয়মগুলির মধ্যে ছিল তিনটি প্রতিজ্ঞা। প্রত্যেক সন্ন্যাসীকে এই তিনটি প্রতিজ্ঞা পালন করতে হত। ১। দারিদ্র, ২। ব্রহ্মচর্য, ৩। আদেশ পালন। অর্থাৎ সন্ন্যাসীর কোন অর্থ সম্পদ থাকবে না ; তাঁকে সম্পূর্ণ দরিদ্রের মত জীবন কাটাতে হবে। ২। তিনি বিয়ে করতে পারবেন না ; সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে। ৩। তাঁকে মঠের প্রধানের আদেশ কোনরূপ বিচার না করেই পালন করতে হবে।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বিস্তারঃ বেনেডিক্টের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইউরোপের নানা জায়গায় ঐ সম্প্রদায় মঠ স্থাপন করে। আয়রল্যাণ্ডেও আর এক জনপ্রিয় সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তারাও নানা স্থানে মঠ তৈরী করে। এছাড়া আরও অনেক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। পুরুষ ও নারী উভয়েই সন্ন্যাস ধর্ম নিতে

পারতেন। পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা আলাদা মঠও তৈরী হয়।

ফ্রায়ার সম্প্রদায়ঃ সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ লোকালয় থেকে দূরে মঠ তৈরী করে সেখানে থাকতেন। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে (আজ থেকে ৬০০ বছর আগে) ফ্রায়ার নামে এক নতুন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের জন্ম হয়। তাঁরা লোকালয়ে গিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে তাদের ধর্ম শিক্ষা দিতেন। ফলে তাঁরা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

সন্ন্যাসীদের জীবন: আমাদের দেশের সন্ন্যাসীদের মত খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীরা শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে উপাসনা করতেন। সারাদিন পূজো ছাড়াও তাঁরা লেখাপড়া করা, শিক্ষা দেওয়া, রোগীর চিকিৎসা করা প্রভৃতি নানা কাজে ব্যস্ত থাকতেন। প্রত্যেক মঠেই একজন প্রধান থাকতেন। তাঁর আদেশমতই মঠের জীবন চলত। সন্ন্যাসীরা নিজেদের কাজ নিজেরাই করতেন। প্রত্যেক গ্রন্থাগার, স্কুল, ডাক্তারখানা, পশুশালা ছিল। তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা ও দরিদ্রকে ভিক্ষাদানের ব্যবস্থা সকল মঠেই থাকত।

ঈশ্বরের উপাসনা সন্ন্যাসীদের প্রধান কাজ হলেও, তাঁরা জ্ঞানের বিস্তার ও দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় ওপরও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন।

উত্তর করে শেখো

১। খ্রীষ্টানদের মধ্যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল কিভাবে?
২। খ্রীষ্টান সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী আলোচনা কর।
৩। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের বিস্তার সম্বন্ধে কি জান?

দ্বাবিংশ পাঠ

সভ্যতায় মঠ ও সন্ন্যাসীদের অবদান

সন্ন্যাসী মঠ দ্বারা সমাজের উপকারঃ সন্ন্যাসীরা সমাজ থেকে দূরে অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে মঠ তৈরী করে কাজ করতেন। তাঁরা নিজেদের মুক্তিকেই জীবনের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেন। কিন্তু তবু সন্ন্যাসীরা ও তাঁদের স্থাপিত মঠ কতভাবে যে সমাজের উপকার করেছে তার সীমা নেই।

সমাজকে উচ্চ আদর্শের জীবন কাটাতে উৎসাহিত করা: সন্ন্যাসীরা আদর্শ জীবন কাটাতেন। তাঁদের জীবন যাপন প্রণালী সাধারণ মানুষকে উচ্চ আদর্শে জীবন কাটাতে উৎসাহিত করত। সন্ন্যাসীদের কঠোর পরিশ্রম, বিদ্যানুরাগ, গরীবকে দান ও দুঃস্থকে সেবা করা সমাজের আদর্শ ছিল। সময়ানুবর্তিতা, ভদ্রতা, জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠকে সম্মানদান প্রভৃতি গুণও সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে সমাজ পেয়ে থাকে।

কৃষি ও শিল্প কাজের উন্নতি: মঠের জন্য কৃষি, পশু পালন ও নানারকম শিল্প কাজ সন্ন্যাসীদের নিজেদের হাতে করতে হত। আবার সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকেই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। ফলে তাঁরা উপরে বর্ণিত কাজগুলি উন্নততরভাবে করতে শিখে নেন। ফলে সমাজের অর্থসম্পদ এইভাবে বৃদ্ধি পায়।

স্থপতিবিদ্যা চিত্রকলা ও সঙ্গীতে উন্নতি: সন্ন্যাসীদের মঠগুলি অনেকটা দুর্গের মত থাকত। বড় বাড়ীর সেইসব দেওয়ালে ধর্মবিষয়ক সুন্দর সুন্দর ছবি থাকত। মধ্যযুগের অবস্থাপন্ন লোকদের ঘরবাড়ী অনেকটা মঠের অনুকরণে তৈরী হত। মঠে যে ধর্ম সঙ্গীত হত, তা সঙ্গীতের প্রতি সমাজের লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করত।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান: সন্ন্যাসীরা জ্ঞানের চর্চায় অগ্রণী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ধর্ম সম্বন্ধীয় বই লেখেন—অনেক পুরাতন পুঁথি নকল করে তাদের নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। সন্ন্যাসীরা জনসাধারণের জন্য মঠে স্কুল চালাতেন। মধ্যযুগে মঠগুলিই বিশেষভাবে সমাজে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে রাখে। সংক্ষেপে, মধ্যযুগের সমাজ সন্ন্যাসী ও মঠের চারদিকে আবর্তিত ছিল।

উত্তর করে শেখো

১। সন্ন্যাসীরা কিভাবে সমাজের উপকার করেন?

২। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীদের অবদান কি?

৩। কৃষি, স্থপতিবিদ্যা, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে সন্ন্যাসীদের অবদান সম্পর্কে একটি ছোট রচনা লেখ।

ত্রয়োবিংশ পাঠ

ধর্মের ক্ষেত্রে সংসারী লোকের কর্তৃত্বের চেষ্টা

চার্চের অর্থ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধিঃ খ্রীষ্টান ধর্মের প্রসারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টান চার্চের অর্থসম্পদ ও প্রতিপত্তি যে খুব বেড়ে গেল তা আগেই বলা হয়েছে। সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ও তাঁদের মঠের সম্বন্ধেও ঐ কথা সত্য। প্রত্যেক মঠই প্রচুর অর্থসম্পদের মালিক হয়। অবশ্য সংসারী ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টানদের দানই এর মূলে ছিল। কিন্তু চার্চ ও মঠের অর্থসম্পদ বেশ কিছু লোককে প্রলুব্ধ করে তোলে।

মঠের উপর সংসারী মানুষের কর্তৃত্বের চেষ্টাঃ দশম শতাব্দী নাগাদ নানাকারণে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলি নৈতিক মানে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে সামন্তেরা গায়ের জোরে মঠের ওপর কর্তৃত্ব করতে আরম্ভ করেন। তাই মঠকে তাঁরা নিজেদের জমিদারীর অংশ বলে মনে করেন। সামন্তদের সমর্থনে অনেক মঠে সংসারী লোক অধ্যক্ষ হয়ে বসেন। মঠগুলির যে আয় হত তাঁরা তা নিজের স্বার্থে ব্যয় করতে থাকেন। শেষে মঠ চালানো এক ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল। এই অবস্থায় মঠের সন্ন্যাসীরা অধঃপতনের প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌছান। এ অবস্থা আরও কিছুদিন চলতে থাকলে মঠগুলি যে বিলুপ্ত হয়ে যেত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ক্লুনিয়াক সম্প্রদায়ের মঠ সংস্কার আন্দোলনঃ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অনেকেই মঠগুলিকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করেন। এ চেষ্টায় ক্লুনিয়াক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে ক্লুনির মঠ স্থাপিত হয়। ক্লুনির মঠ থেকে যেসব সন্ন্যাসী দীক্ষা নেন, তাদের আমরা ক্লুনিয়াক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী বলতে পারি। ক্লুনিয়াক সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা এক নতুন প্রশাসন প্রবর্তন করে তাঁদের মঠগুলিকে সামন্ত ও সংসারী লোকের কর্তৃত্ব থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হন। এই প্রশাসন অনুসারে কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের যতগুলি মঠই থাকুক না কেন, তার কর্তা হতেন মূল-মঠের অধ্যক্ষ। অন্যান্য মঠের প্রধানেরা তাঁর কর্মচারী হিসাবে মঠ পরিচালনা করতেন। বিভিন্ন মঠের প্রধানদের প্রধান মঠের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করতেন। এই প্রশাসন প্রবর্তনের ফলে মঠগুলি সংসারী লোকের কর্তৃত্ব থেকে রক্ষা পায়।

সঙ্গে সঙ্গে ক্লুনিয়াক সম্প্রদায় সন্ন্যাসীদের নৈতিক মান উন্নত করার চেষ্টা করেন। প্রত্যেক মঠ ও প্রত্যেক সন্ন্যাসী যাতে বেনেডিক্টের অনুশাসনগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেন, সেদিকে তাঁরা বিশেষ নজর দেন। এছাড়া ব্রহ্মচর্য রক্ষার ওপরও বেশ জোর দেওয়া হয়। প্রধানতঃ ক্লুনিয়াকদের সংস্কার আন্দোলনের ফলে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ও মঠগুলি বিলুপ্তির হাত থেকে বেঁচে যায়।

সংসারী লোকের ধর্মযাজকদের ওপর কর্তৃত্ব করার চেষ্টা: পোপের নেতৃত্বে খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করে চলছিলেন তা তোমরা পড়েছ। রোমান সাম্রাজ্যের প্রশাসনের অনুকরণে ধর্মযাজকদের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রায় প্রতি গ্রামেই একজন করে ধর্মযাজক থাকতেন। ধর্মযাজকদের ওপরে থাকতেন ভাইকারগণ। ভাইকারগণের ওপরে হলেন বিশপ এবং সকলের ওপরে হলেন পোপ। খ্রীষ্টান ধর্মের বিস্তারের সঙ্গে চার্চের প্রত্যেক স্তরের কর্মচারীর হাতে এল প্রচুর অর্থ—সমাজের ওপর তাঁদের প্রভাবও হল যথেষ্ট।

সম্রাট ও পোপের মধ্যে দ্বন্দ্ব: চার্চের অর্থ ও ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটেরা চার্চের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন। পোপের অধীনে চার্চ যে আর একটি স্বাধীন প্রশাসন চালাবে তা তারা পছন্দ করলেন না। পোপসহ চার্চের সকলকেই সম্রাটের অধীনতা মেনে নিতে হবে। সম্রাটেরা পোপের সঙ্গে পরামর্শ না করেই চার্চের কর্মচারী নিয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। চার্চের কর্মচারীরা সম্রাটের অনুগত থাকলে চার্চের ওপর সম্রাটের কর্তৃত্ব থাকবে। পোপ কিন্তু চার্চের ওপর সম্রাটের এই কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন চার্চ সাম্রাজ্যের ওপর। তাই চার্চের কর্মচারী নিয়োগ নিয়ে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হল। এ হল একাদশ শতাব্দীর কথা। এ দ্বন্দ্ব বহুদিন চলেছিল। ইতিহাসে একে ইনভেস্ট-টিওর দ্বন্দ্ব বলা হয়।

উত্তর করে শেখো

১। খ্রীষ্টান মঠের ওপর কিভাবে সংসারী লোকেরা কর্তৃত্ব করে ?

২। খ্রীষ্টান মঠগুলিকে রক্ষা করার জন্য ক্লুনিয়ার সম্প্রদায় কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ?

৩। সম্রাট ও পোপের মধ্যে দ্বন্দের কারণ কি ?

চতুর্বিংশ পাঠ

মধ্যযুগে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়

বিদ্যালয় ঃ মধ্যযুগে বেশীর ভাগ লোকই লেখাপড়ার ধার ধারতো না। সামন্তদের ছেলেদের পর্যন্ত লেখাপড়ার পাঠ ছিল না ; তাদের যুদ্ধ করা ও শিকার করা শিখতে হত—তা তারা শিখত শিক্ষানবিশী হয়ে। কারিগরের ছেলেরাও শিল্প কাজ শিখত শিক্ষানবিশী হয়ে। একমাত্র যারা ধর্মযাজকের কাজে বা রাজ-কর্মচারীর কাজে যোগ দেবে তাদের লেখাপড়া শিখতে হত। তাদের শিক্ষা হত মঠ ও গীর্জার স্কুলগুলিতে। মঠ ও গীর্জার স্কুলে ল্যাটিন ভাষা ও ব্যাকরণ শেখান হত। এছাড়া তর্কশাস্ত্র ও বক্তৃতা দেওয়ার শাস্ত্রও ছাত্রদের পড়ান হত। অঙ্ক, জ্যামিতি ও নক্ষত্র বিদ্যাও শিখতে হত। লেখাপড়া শেখার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য বই ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ঃ ক্রমে দর্শন, আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি পড়ার চাহিদা সমাজে দেখা দিল। এসব চাহিদা মেটানোর জন্য স্থাপিত হল বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞানের উচ্চতর ক্ষেত্রের আলোচনা হয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা খুব বেশী হতে পারে না। তাই দেশ বিদেশ থেকে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে।

মধ্যযুগের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাদের শিক্ষক বা আচার্যদের খ্যাতিতেই গড়ে ওঠে। ধর, কোন মঠ বা গীর্জায় খুব পণ্ডিত একজন

শিক্ষক আছেন। তাঁর কাছে জ্ঞানের উচ্চতর ক্ষেত্রের পড়াশুনা করা হয়। তাঁর খ্যাতি রটে গেল। দেশ বিদেশ থেকে ছাত্রছাত্রীরা তাঁর কাছে পড়বে বলে এসে উপস্থিত হল। শিক্ষার উন্নতির জন্য এ ধরনের কয়েকজন আচার্য একত্রিত হলেন। এক একজন হয়ত এক এক বিষয়ে



বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস

বিশেষজ্ঞ। তাঁদের চারপাশে ছাত্র জোটার সঙ্গে সঙ্গে ঘরবাড়ীও তৈরী হল—স্থাপিত হল বিশ্ববিদ্যালয়। আচার্যদের খ্যাতির জন্য কিছু কিছু মঠ ও গীর্জার বিদ্যালয়ও বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে রূপান্তরিত হল।

কয়েকটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে। সবশুদ্ধ প্রায় আশিটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সাধারণতঃ এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক এক বিষয় পড়ানোর বিশেষ খ্যাতি হয়। এদের মধ্যে চারটে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ নাম করা যায়। ১। ইতালির সালেরনো বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে বিশেষভাবে চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনা হয়। ২। বিশেষভাবে আইন পড়ানোর জন্য বলোনা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র, অঙ্ক ও ধর্মশাস্ত্র পড়ানোর বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। ৪। ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্যারিসের অনুকরণে স্থাপিত হয় ও একধরণের বিষয় পড়ানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসনঃ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্বাধীন। রাষ্ট্র তার কাজে হাত দিত না। এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কোন অপরাধ করলে বিশ্ববিদ্যালয় তার বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করত। ছাত্রদের বিচারের অধিকার সরকারের ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা দেশ থেকে ছাত্রেরা পড়তে আসত, একথা আগেই

বলা হয়েছে। এক এক দেশের ছাত্রকে এক এক "নেশন" বলা হত। প্রত্যেক নেশন আলাদা আলাদা সংঘ বা "গিল্ড" গঠন করত। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের বেশ কয়েকটি করে গিল্ড থাকত। গিল্ডগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে নিজেদের জন্য অনেকখানি স্বায়ত্ব শাসন আদায় করে নিত। গিল্ডগুলি তাদের সভ্যদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করত। মাঝে মাঝে "নেশনে" "নেশনে" ঝগড়াঝাটি এমন কি মারামারি পর্যন্ত হত। অনেক সময় শহরের লোকদের সঙ্গেও বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকের দাঙ্গা বাঁধত।

ছাত্র জীবন ঃ ছাত্রদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। ফলে যেমন ভাল ভাল ছাত্র ছিল, তেমন অনেক ছাত্র আবার পড়াশুনা না করে শহরে নানা রকম অসংযত আচরণ করে বেড়াত। তখনকার দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এক বিশেষ ধরনের গাউন পরত। এখনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যারা ডিগ্রি পান, সমাবর্তনের সময় তাঁরা ঐ ধরনের টুপি ও গাউন পরেন। পড়ানোর জন্য তখন অধ্যাপকের আলাদা আলাদা ঘর ছিল না। ছাত্রেরা বাঁধান মেঝেতে বসে অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনত। মধ্যযুগে এখনকার মত ছাপা বই পাওয়া যেত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পাঠ্য বই সব নকল করে রাখা হত। গ্রন্থাগারে বসে ছাত্রদের পড়াশুনা করতে হত। খুব মূল্যবান বই ছাত্রেরা নিজেরা নকল করে নিত।

অধ্যাপকদের খুব দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হত। পড়ানোর মাধ্যমে তাঁদের ছাত্রদের সন্তুষ্ট রাখতে হত। ক্লাস কিছু বাধ্যতামূলক ছিল না। যেসব অধ্যাপকের ক্লাসে ছাত্র হত না, তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হত। ছাত্র শিক্ষক সম্বন্ধ পরস্পর দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিতে গড়ে উঠত।

অনেক সময় ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে ঘুরে এক এক বিষয় শিখতে হত। সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সব বিষয় পড়ান হতনা।

কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিত ঃ মধ্যযুগের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম তোমাদের জেনে রাখা ভাল। ফরাসী দেশের পিটার এবেলার্ড ছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত। তিনি প্রচার করতেন যে ভাল করে না জেনে, না বুঝে কিছু গ্রহণ করবেন না। এলবার্ট ছিলেন আর একজন জার্মান পণ্ডিত। বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আলবার্ট

অনেক বই লিখে গেছেন। ইটালির পণ্ডিত টমাস একুয়াইনাস ছিলেন আলবার্টের শিষ্য। অল্প বয়সে মারা গেলেও তিনিও আঠারখানা বড় বড় বই লিখে গেছেন। ইংরেজ পণ্ডিত রোজার বেকন ছিলেন একজন বড় বৈজ্ঞানিক। বারুদ ও বাষ্পীয় শক্তি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল যথেষ্ট।

উত্তর করে শেখো

ক। নীচের বাঁ দিকে ও ডানদিকে কয়েকটি নাম আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে। বাঁ দিকের যে নামের সঙ্গে ডানদিকের নামের সম্বন্ধ রয়েছে, সে নামের বাঁদিকের সংখ্যা ডানদিকের নামের বন্ধনীর ভেতর লেখ।

বাম দিক		ডান দিক	
১। সালোরনো	২। পিটার এবেলার্ড	ফ্রান্স ( )	আইন ( )
৩। প্যারিস	৪। বলোনা	চিকিৎসা ( )	জার্মানি ( )
৫। আলবার্ট	৬। টমাস একুয়াইনাস	ইটালি ( )	বিজ্ঞান দর্শন ( )

খ। মধ্যযুগে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল আলোচনা কর।

গ। মধ্যযুগে ছাত্র ও অধ্যাপকদের জীবন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

ঘ। মধ্যযুগে বিদ্যালয় সম্বন্ধে যা জান লেখ।

পঞ্চবিংশ পাঠ

ফিউডল বা সামন্ত প্রথা

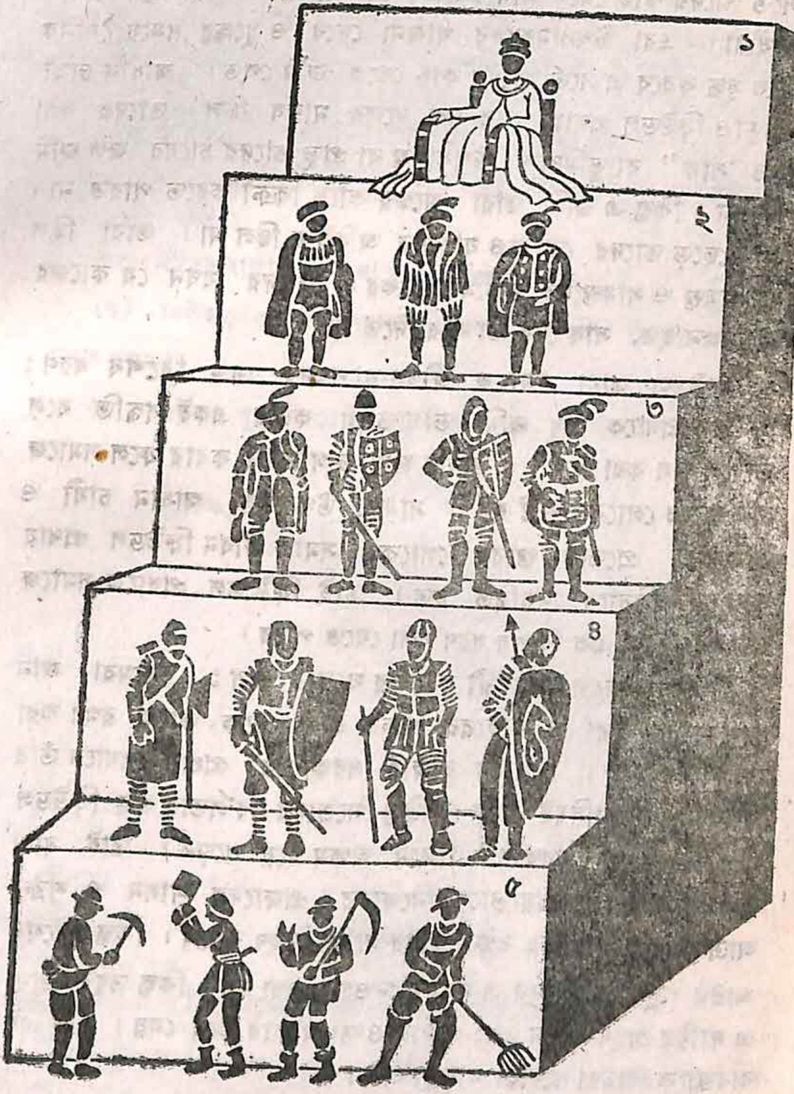
অরাজকতা ও জনসাধারণের জীবনে অনিশ্চয়তা ঃ মধ্যযুগে শত শত বছর ধরে ইউরোপে অরাজকতা চলে। রাজার ক্ষমতা ছিল খুব দুর্বল। তার ওপর সব সময়েই বারবেরিয়ান ও অন্যান্য দুর্ধর্ষ জাতিদের আক্রমণ ত লেগেই থাকত। সাধারণ চাষীদের সব সময় আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হত। কখন তাদের শস্য ও ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হবে, কখন তাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের ধরে নিয়ে দাস করা হবে এসব দুশ্চিন্তার মধ্যেই তাদের দিন কাটাতে হত।

লর্ড বা সামন্তঃ রাজাদের যাঁরা প্রধান সহায়ক, তাদের লর্ড বা সামন্ত বলা হত। তাঁরা যুদ্ধ ও দেশ শাসনে রাজাকে সাহায্য করতেন। বিনিময়ে তাঁরা রাজার কাছ থেকে জায়গা জমি পেতেন। রাজা দুর্বল হওয়ার জন্য সামন্তদের নিজেদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিজেদের করতে হত। অবশ্যই তাঁরা অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁরা উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা দুর্গের মত বড় বড় বাড়ী তৈরী করতেন। তাঁরা নিজেদের সৈন্য সামন্তও রাখতেন। নামে রাজার অধীনে থাকলেও, তাঁরা স্বাধীন ভাবেই চলতেন।

"ফিউডল" বা জমিদারী প্রথার সৃষ্টি: বারবেরিয়ান ও অন্যান্য দুর্ধর্ষ জাতির ক্রমাগত আক্রমণে বিপন্ন হয়ে সাধারণ চাষীরা সামন্তদের কাছে আশ্রয় চায়। আক্রমণের সময় যাতে তারা সামন্তদের দুর্গের ভেতর থাকতে পারে ও সামন্তদের সৈন্যদের সাহায্য পায় এই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তার বিনিময়ে তারা নিজেদের জায়গা জমি সামন্তদের নামে লিখে দিয়ে তাদের প্রজা হয়ে থাকতে রাজী হয়। এই চুক্তির সর্তে সামন্তেরা জমির মালিক হলেও নিজেদের জমি চাষ করার অধিকার চাষীদের হাতে থাকে। তারা সামন্তদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল বা অর্থ দিতে স্বীকার করে। এছাড়াও চাষীদের সামন্তদের আরও অনেক কাজ করে দিতে হয়। এমনকি, প্রয়োজন হলে যুদ্ধের সময় সৈন্য হয়ে যুদ্ধও করতে হয়। এ চুক্তির সর্ত অনুসারে সামন্তেরা চাষীদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেন। এভাবে ইউরোপে 'ফিউডল' বা জমিদারী প্রথার সৃষ্টি হয়। ৮০০ থেকে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পাঁচশো বছর সময় ইউরোপের ইতিহাসে 'ফিউডল' বা জমিদারী যুগ বলে খ্যাত।

ফিউডল প্রথার পর পর ধারাঃ ফিউডল প্রথায় সকলের ওপর ছিলেন রাজা। আইন মত রাজ্যের সকল জমির মালিক তিনিই। সামন্তদের রাজার অধিকার স্বীকার করে জমির ভোগের জন্য তাঁকে খাজনা দিতে হত ও যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে হত। রাজা দুর্বল হলে অবশ্য সামন্তেরা রাজাকে মানতেন না। সামন্তদের নীচে

ছিল উপসামন্তেরা। এক একজন সামন্তের এত জমি ও এত প্রজা



১। রাজা, ২। সামন্ত, ৩। উপসামন্ত,
৪। নাইট (যোদ্ধা), ৫। কৃষক

থাকত যে উপসামন্তের সাহায্য ছাড়া তিনি জমির দেখাশুনা বা প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা প্রভৃতি আদায় করা কাজ করে উঠতে

পারতেন না। উপসামন্তরা, সামন্তদের সৈন্য ও টাকা যোগাবেন এ সর্তে তাদের কাছ থেকে জমি পেতেন। উপসামন্তদের পরে ছিল স্বাধীন চাষীরা। এরা উপসামন্তদের খাজনা দেবে ও যুদ্ধের সময়ে সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করবে এ সর্তে তাদের কাছ থেকে জমি পেত। স্বাধীন চাষী ছাড়াও ফিউডল প্রথায় আর এক দলের মানুষ ছিল। তাদের বলা হত "সার্ফ" বা ভূমিদাস। উপসামন্ত বা প্রভু তাদের চাষের জন্য জমি দিতেন। কিন্তু এ জমি তারা অন্যের কাছে বিক্রী করতে পারত না। জমি ছেড়ে তাদের কোথাও যাওয়ার অধিকার ছিল না। তারা ছিল উপসামন্ত ও সামন্তদের হুকুমের চাকর। তাদের যখন যে কাজের প্রয়োজন হত, সার্ফদের তা করে দিতে হত।

ফিউডল প্রথা সমাজে জীবন-যাপনের এক বিশেষ ধরণ: ফিউডল প্রথাকে শুধু জমি ভাগাভাগি করার একই পদ্ধতি বলে ভাবলে ভুল করা হবে। এ প্রথায় জমি ভাগাভাগি করার ফলে সমাজে চার স্তরের লোকের সৃষ্টি হয়। সামন্ত, উপসামন্ত, স্বাধীন চাষী ও ভূমিদাস। প্রত্যেক স্তরের লোকের সমাজ জীবন ফিউডল প্রথায় তার স্থান হিসাবে নিয়ন্ত্রিত হত। তাই ফিউডেল প্রথাকে সমাজে জীবনযাপনের এক বিশেষ ধরণ বলা যেতে পারে।

ফিউডল যুগে সরকারী কাজের ঘরোয়া রূপ: তোমরা জান দেশ শাসন করা ও বাইরের শত্রুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা সরকারের কাজ। যেখানে রাজাই সরকারের প্রধান সেখানে তাঁর ওপরই এ দু' দায়িত্বই থাকে। কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার জন্য ফিউডল যুগে রাজারা এ দায়িত্ব দুটি পালনে অক্ষম হয়ে পড়েন। তাই বাধ্য হয়ে সামন্তেরা ঘরোয়াভাবে নিজেদের প্রজাদের শাসন ও শত্রুর আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু দেশের আইন অনুসারে তাদের এ দায়িত্ব নেওয়ার কথা নয়। কিন্তু তবুও তারা এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং প্রজারাও তা স্বীকার করে নেয়। তাই এই ব্যবস্থাকে আমরা ঘরোয়া ব্যবস্থা বলি।

উত্তর করে শেখো

১। জনসাধারণের জীবনের অনিশ্চয়তার জন্য কি ভাবে ফিউডেল প্রথার সৃষ্টি হয় বুঝিয়ে লেখ।

২। ফিউডল প্রথার পর পর ধাপগুলি নক্সা এঁকে দেখাও।

৩। স্বাধীন চাষী ও ভূমিদাস এবং সামন্ত ও উপসামন্তের মধ্যে কি প্রভেদ ছিল বুঝিয়ে লেখ।

৪। নীচের বাক্য দুটির কথা বুঝিয়ে লেখ—

(ক) ফিউডল প্রথাকে সমাজে জীবনযাপনের এক বিশেষ ধরণ বলা যেতে পারে।

(খ) ফিউডল যুগে সরকারী কাজ ঘরোয়া রূপ নিয়েছিল কিভাবে?

ষড়বিংশ পাঠ

ফিউডেল যুগের দুর্গের স্থান

ভারতের রাজাদের দুর্গ: তোমাদের অনেকে হয়ত পুরাতন দুর্গ দু' একটা দেখে থাকতে পার। যারা দিল্লী বা আগ্রা গিয়েছ তারা মুসলমান সম্রাটদের তৈরী দুর্গ অবশ্যই দেখেছ। দিল্লীর লালকেল্লা (দুর্গ) থেকে ত প্রতিবছর স্বাধীনতা উৎসবে আমাদের প্রধান মন্ত্রী ভাষণ দিয়ে থাকেন।

ফিউডল যুগে দুর্গের রূপ : ফিউডল যুগে এই দুর্গ সমাজজীবনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে। বড় বড় সামন্তেরা নিজেদের নিরাপদে রাখার জন্য নিজেদের ভূসম্পত্তির মাঝখানে একটা করে দুর্গ তৈরী করতেন। প্রথম প্রথম মাটি ও কাঠ দিয়ে তৈরী হলেও পরে দুর্গগুলি ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী করা হত। দুর্গের ভেতরে যাতে সহজে কেউ ঢুকতে না পারে, তার জন্যে দুর্গগুলি উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত।



দুর্গ

একই উদ্দেশ্যে দেওয়ালের চারদিকে থাকত গভীর খাল বা পরিখা। দুর্গে যাতায়াতের জন্যে পরিখার ওপরে থাকত ঝোলানো সেতু। প্রয়োজন হলে, এ সেতু তুলে নিলে, দুর্গে যাওয়ার আর পথ থাকত না।

ভেতরের ঘর বাড়ী : দুর্গের ভেতরে নানা কাজের জন্য অনেকগুলি ঘর বা কোঠা থাকত। যেমন, সভা বা অভ্যর্থনা করার ঘর, অফিসের কাজকর্ম করার ঘর, খাওয়ার ঘর, শোবার ঘর, শস্য রাখার ঘর, অস্ত্র-শস্ত্র রাখার ঘর ইত্যাদি। এসব ঘর সরকারী কাজে ব্যবহার করা হত। জমিদারীর নানা কাজের

জন্য দুর্গে অনেক লোক থাকত। কিছু সৈন্য-সামন্তকেও দুর্গের ভেতর থাকতে হত। তাছাড়া শত্রু আক্রমণ করলে সাধারণ প্রজারাও এসে দুর্গে আশ্রয় নিত। দুর্গের ঘরবাড়ীগুলি তাদের ব্যবহারেই লাগত। সামন্ত বা লর্ডের থাকবার জন্য এসব ঘরবাড়ী থেকে দূরে আলাদা ঘর-বাড়ী থাকত। ছোট ছোট সামন্ত বা উপ-সামন্তদের দুর্গ তৈরী করার মত যথেষ্ট টাকা-পয়সা ছিল না—তবুও তাদের বাড়ী বেশ বড় সড় ও মজবুদ ছিল।

প্রশাসনের কেন্দ্র ঃ দুর্গের ভেতর থেকেই জমিদারীর সবরকম কাজকর্ম চলত। রাজস্ব আদায়কারী, পুলিশ, বিচারক ও জমিদারীর আর সব কর্মচারীর অফিস দুর্গের মধ্যে ছিল। সামন্তই সবরকম কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। তিনি অনুপস্থিত থাকলে তাঁর স্ত্রী কাজকর্ম দেখার দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।

রাজসভা ঃ দুর্গের মধ্যে রাজসভার অনুকরণে সভা বসত। সামন্ত ও তাঁর স্ত্রী জাঁক-জমকপূর্ণ পোষাক পরে রাজা, রাণীর মত সভায় এসে বসতেন। রাজ-কর্মচারীরা উপযুক্ত পোষাক পরে, নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বসত। উপ-সামন্ত ও স্বাধীন চাষীরা "রাজসভায়" উপস্থিত থাকত। "রাজসভায়" সকলকেই ঠিক ঠিক আদব-কায়দা মেনে চলতে হত। এ সভায় প্রজাদের সবরকমের বিচার করা হত।

সমাজ-জীবনের কেন্দ্র ঃ দুর্গে লেখাপড়ার জন্য স্কুল থাকত। ঐ স্কুলে সামন্ত ও উপ-সামন্তদের ছেলেমেয়ে ছাড়া সাধারণ প্রজাদেয় বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরাও পড়তে পারত। অসুখ হলে যে একটু-আধটু চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল, তা দুর্গ থেকেই করা হত। প্রশাসন, বিচার, বিদ্যালয়, চিকিৎসা—সব কিছুর ব্যবস্থা দুর্গে থাকায় দুর্গ সমাজ-জীবনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

উত্তর করে লেখো

১। নীচের লেখা বিষয়গুলির বর্ণনা দাও—

(ক) দুর্গ কিভাবে তৈরী হত? (খ) তার ভেতরের ঘরবাড়ী, (গ) দুর্গের রাজসভা।

২। দুর্গকে কেন সমাজ-জীবনের কেন্দ্র বলা হয়েছে বুঝিয়ে লেখ।

সপ্তবিংশ পাঠ

ফিউডেল যুগে "নাইট" আন্দোলন

নাইট আন্দোলনের জন্ম ঃ আমাদের দেশের তরুণরা যোগ দিতে পারে, এমন কিছু ভাল আন্দোলনের নাম তোমরা নিশ্চয়ই জান। যেমন "স্কাউট" বা "ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোর" (এন. সি. সি.) আন্দোলন। "নাইট আন্দোলন" ঐ ধরনের এক আন্দোলন।

তখন ইউরোপের সর্বত্র রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে। চারদিকে অরাজকতা চলছে। যার শক্তি আছে, সে যা খুশী করে বেড়াচ্ছে। এর মধ্যে আবার "অসভ্য" জাতিদের আক্রমণ ও লুঠতরাজ তো লেগেই রয়েছে। সামন্ত ও উপ-সামন্তদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না। তাদের কোন কাজকর্মও নেই। সমাজের অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সুযোগ নিয়ে কাজকর্মহীন তরুণরা যাতে বিপথগামী না হয়, তারজন্য "নাইট" আন্দোলনের মত একটা আন্দোলনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টান চার্চ এই আন্দোলন সৃষ্টি করতে বিশেষ সহযোগীতা করে। কারণ তখনকার দিনে চার্চ সমাজে শৃঙ্খলা ও সুরুচিপূর্ণ জীবন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। চার্চ, রাজা, সামন্ত ও উপ-সামন্তদের উৎসাহে সমাজে নাইট আন্দোলন জন্ম নেয়।

নাইট হওয়ার জন্য শিক্ষা ঃ রাজা, সামন্ত ও উপ-সামন্তের ছেলেরাই শুধু নাইট আন্দোলনে যোগ দিতে পারত। নাইট হওয়ার জন্য অল্প বয়স থেকেই তাদের শিক্ষানবিশী থাকতে হত। কোন রাজা বা সামন্তকে "প্রভু" মেনে নিয়ে তাঁর কাছে ভবিষ্যৎ নাইটকে শিক্ষানবিশী হিসাবে পাঁচ থেকে সাত বছর থাকতে হত। শিক্ষানবিশীর সময় তাকে "স্কোয়ার" বলা হত। স্কোয়ারকে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করা হত না। কিন্তু সবরকম অস্ত্রচালনা ও শিকার করার বিদ্যায় তাকে বিশেষভাবে দক্ষ করা হত। জীবনের জন্য উচ্চ আদর্শ যাতে তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করে, তার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হত। ভবিষ্যৎ নাইট ব্যবহারে যাতে শিষ্টাচার শেখে তার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হত।

নাইট পদে অভিষেক ঃ শিক্ষানবিশী কাল শেষ হলে, স্কোয়ারকে নাইট হিসাবে অভিষেক করা হত। এই অভিষেক উৎসব হত পবিত্র, গুরুগম্ভীর ও জাঁকজমকপূর্ণ। স্কোয়ারকে অভিষেকের আগের

দিন উপবাস থাকতে হত। সন্ধ্যাবেলায় স্নান করে সে উপাসনা করত। পরদিন সকালবেলা, পবিত্র মন নিয়ে সে গীর্জায় যেত। ধর্মযাজক তখন তাকে নাইট হওয়ার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। গীর্জা থেকে দুর্গে ফিরে আসার পর "প্রভু" তাকে নাইট-এর উপযুক্ত পোষাক ও তলোয়ার দিতেন স্কোয়ার তখন হাঁটু গেড়ে "প্রভুর" সামনে বসত। প্রভু তার কাঠের ওপর নিজের তলোয়ার রাখতেন ও ঘোষণা করতেন, "তুমি বীর, সাহসী ও প্রভুভক্ত নাইট হও।" এভাবে অভিষেক হওয়ার পর নাইট, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চেপে নানা রকম যুদ্ধ কৌশল দেখাতেন।



নাইট

নাইটদের ব্যবহার নীতি বা সিভালরী ঃ নাইট হওয়া সহজ কথা ছিল না। নীচের লেখা গুণগুলিকে ব্যবহারে রূপায়িত করার জন্য নাইটদের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকতে হত—(১) প্রভুভক্তি, (২) শিষ্টাচার, (৩) প্রতিজ্ঞা পালন, (৪) অত্যাচারিত মানুষকে রক্ষা করা (৫) সর্বদা ন্যায়ের পক্ষ-সমর্থন, (৬) স্ত্রীলোক ও অনাথ শিশুদের রক্ষা করা, (৭) খ্রীষ্টান ধর্মকে রক্ষা করা।

এসব গুণ অনুসারে কাজ করাকে, এক কথায় "সিভালরী" (chivalry) বা বীরোচিত কাজ বলা হত।

"টুর্নামেণ্ট" ঃ তোমরা সকলেই কোন-না-কোন "টুর্নামেণ্টে" যোগ দিয়েছ। "টুর্নামেণ্ট" কথাটা নাইটদের যুগ থেকেই চালু হয় নাইটরা তলোয়ার, কুঠার, বর্শা, ঢাল ও বর্ম নিয়ে ঘোড়ায় চ চলতেন। শিকার ও টুর্নামেণ্ট প্রতিযোগিতা করা ছিল তঁ জীবনের প্রধান আনন্দ। "টুর্নামেণ্ট" হল, এক সঙ্গে মিলিত বীরোচিত খেলায় প্রতিযোগীতা করা। বিশাল মাঠে টুর্নামেণ্ট হত। গ্রামের লোক টুর্নামেণ্ট দেখতে উপস্থিত হত।

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ (Duel) ঃ নাইটদের সময় থেকে "দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ কথাটাও বিশেষ করে চালু হয়েছে। যুদ্ধ ছাড়া নাইট

পারতেন না। সিভালরী মত কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই তাঁদের যুদ্ধ করতে হত। কিন্তু যখন যুদ্ধ থাকত না, তখন ছুতো-নাতায় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিতেন। প্রায়ই দুই নাইটের মধ্যে এ ধরণের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বা ডুয়েল হত। এক নাইট অপর নাইটকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করলে (কারণ যতই সামান্য হউক) সে আহ্বানে অস্বীকার করা চলত না। দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে যে নাইট তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অস্ত্রচ্যুত বা বেশী আঘাত করতে পারতেন তাঁর জয় হত। একজন বিচারক থাকতেন। পরাজিত নাইটকে, বিজেতাকে তাঁর ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র মুক্তি-পণ হিসাবে দিতে হত। কখনও কখনও দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নাইটকে প্রাণও হারাতে হত।

ট্রোবাদোর (Troubadour) আন্দোলন ঃ ট্রোবাদোরদের কথা না বলে নাইটদের কথা শেষ করা যায় না। এরা ছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের এক বিশেষ নাইটসম্প্রদায়। ট্রোবাদোরদের সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে, এদের সকলে খুব সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে নন। এর অর্থ সাধারণ বংশের ছেলেদের মধ্যেও নাইট-আন্দোলন কিছুটা ছড়িয়ে পড়ে।

ট্রোবাদোরদের আর একটা বিশেষত্ব হল, মেয়েদের প্রতি অতিরিক্ত সম্মান দেখান। ফিউডেল যুগের প্রথমদিকে সমাজে নারীদের মর্যাদা খুব উঁচু ছিল না। এমনকি সম্ভ্রান্ত পরিবারে স্বামী তাঁর স্ত্রীকে মারধোর করতেন। প্রত্যেক নাইট মেয়েদের প্রতি সম্মান দেখাতেন। কিন্তু ট্রোবাদোররা ছিল একাজে সবার অগ্রণী। প্রত্যেক ট্রোবাদোর একজন মহিলা বা "লেডি"-কে ভালবাসার পাত্রী বলে গ্রহণ করতেন। ট্রোবাদোর যে তাকে বিয়ে করতে চাইতেন এমন নয়। অনেক সময়ই ট্রোবাদোরের "লেডি" বিবাহিতা মহিলা থাকতেন। "লেডি"-কে ট্রোবাদোর সকল গুণের আকর বলে মনে করতেন এবং তাঁর ইঙ্গিতমাত্র তিনি জীবন দান করতে প্রস্তুত থাকতেন। নিজ নিজ "লেডি"-র গুণের বর্ণনা করে ট্রোবাদোররা সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে সাহিত্যকে উন্নত করে গেছেন। ট্রোবাদোররা, নারী ও পুরুষের মধ্যে ভালবাসাকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁদের আন্দোলনের ফলে, সমাজে সাধারণভাবে নারীদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

নাইট-আন্দোলনে সমাজের উপকার ঃ নাইট-আন্দোলনের ফলে ফিউডেল সমাজের অনেক উপকার হয়। বড়লোকের কাজকর্মহীন আদরের ছেলে, আলস্যে ও বিলাসে না থেকে, উচ্চ আদর্শ নিয়ে

নানাভাবে সমাজের উপকার করে জীবন কাটায়। সে যুগে তারা সমাজের দুর্বলশ্রেণীর লোকের প্রধান রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। নাইটরা সমাজে নারীর মর্যাদা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজের সাধারণ লোক নাইটদের গুণকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত ও তাঁদের গুণ অনুকরণ করতে চেষ্টা করত।

উত্তর করে শেখো

১। সমাজের কেমন পরিস্থিতিতে নাইট আন্দোলন জন্ম নেয় তা আলোচনা কর।

২। নাইট হওয়ার শিক্ষা কিভাবে দেওয়া হত বর্ণনা কর।

৩। নীচের বিষয়গুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ— ক) টুর্নামেণ্ট, (খ) দ্বন্দ্বযুদ্ধ, (গ) ফিউডেল যুগে সমাজের মর্যাদা, (ঘ) সিভালরী, ঙ) নাইট-আন্দোলনে সমাজের উপকার।

৪। নাইটের অভিষেক কিভাবে হত বর্ণনা কর।

৫। ট্রৌবাদৌর আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের বিষয় আলোচনা কর।

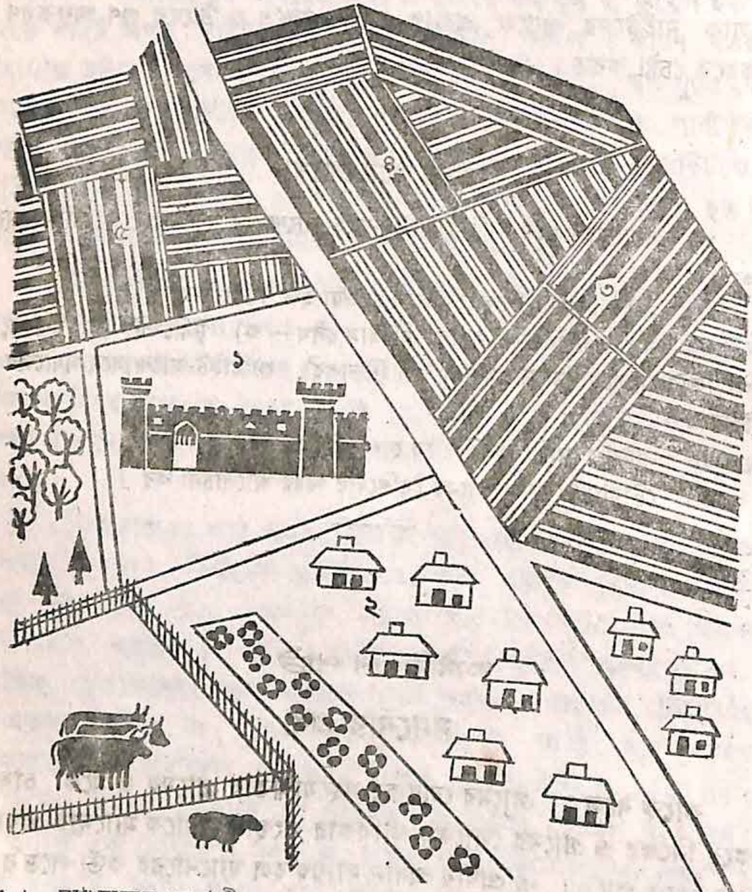
অষ্টবিংশ পাঠ

ম্যানোর প্রথা

কাকে বলে ঃ গ্রামের লোকের সহযোগীতায় গ্রামের জমিকে চাষ করে নিজের ও গ্রামের লোকের জীবিকার সংস্থান করাকে ম্যানোর প্রথা বলা যেতে পারে। এ প্রথায় প্রধান দায়িত্ব হল ম্যানোরের কর্তা লর্ডের ওপর। তিনিই গ্রামের লোকের মধ্যে জমি ভাগ করে দিয়ে চাষবাস করাতেন। তোমরা আগে যে ফিউডেল প্রথার কথা পড়েছ ম্যানোর প্রথা তারই অঙ্গ বলে ধরে নিতে পার। ম্যানোর প্রথা ফিউডেল যুগের গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করত।

ম্যানোর ঃ এক-একজন লর্ড বা জমিদারের জমিদারীকে এক-একটি ম্যানোর বলা হত। ম্যানোর সাধারণতঃ একটি করে গ্রামে থাকত। কিন্তু ম্যানোরের একের বেশী গ্রামও ছিল। আইনমত ম্যানোরের সকল জমির মালিক ছিলেন লর্ড বা জমিদার। তিনি যে স্বাধীন কৃষক ও

সার্ফদের সহযোগীতায় গ্রামের জমি চাষ করাতেন একথা তোমাদের আগেই বলা হয়েছে। আমাদের গ্রামের মত, সকল চাষের জমি যে এক জায়গায় থাকত তা নয়—গ্রামের মধ্যে চাষের জমি ছড়িয়ে থাকত।



১। ম্যানেরের ঘরবাড়ী ; ২। কৃষকের কুঁড়েঘর ; ৩। শীতকালীন জমি ; ৪। পতিত জমি ; ৫। বসন্তকালীন জমি।

ম্যানোরের ঘরবাড়ি : ম্যানোরের মধ্যে খোলা মাঠের ভেতর বা সরু গ্রাম্য রাস্তার দু'পাশে চাষীদের বাড়ী পাশাপাশি থাকত। তাদের বাড়ীতে সচরাচর একটা কোঠাই থাকত—চাল থাকত খড়ের। ধনী চাষীর বাড়া কখনও কখনও কাঠ দিয়ে তৈরী হত। ম্যানোরের মাঝখানে থাকত লর্ডের বাড়ী—ইট, কাঠ দিয়ে তৈরী প্রাসাদের মত। অনেক লর্ডই দুর্গের মধ্যে না থেকে ম্যানোরের বাড়ীতে থাকতেন।

সমবায় প্রথায় চাষবাস ঃ কোন চাষীর পক্ষে একা চাষ করা সম্ভব ছিল না। তার প্রধান কারণ কোন চাষীরই একার চাষের জন্য যথেষ্ট বলদ ছিল না। তখনকার দিনে বলদগুলো ছিল দুর্বল। দশ-বারটি বলদ লাঙ্গলে না জুড়লে শক্ত মাটি চাষ করা যেত না। কাজেই গ্রামের সকল চাষের বলদ একত্র করে গ্রামে যত লাঙ্গল ছিল তাতে ভাগাভাগি করে জুড়ে দেওয়া হত। ফসল কাটার সময় সব চাষী একত্র হয়ে ভাগাভাগি করে ফসল কাটাত। চাষীদের জমিগুলি পাশাপাশি থাকত। এক চাষীর জমি থেকে অপর চাষীর জমি একটা আল দিয়ে মাত্র আলাদা করা হত। ফলে সমবায় প্রথায় চাষের কোন অসুবিধা হত না।

লর্ডের জমি ঃ গ্রামের জমির এক ষষ্ঠাংশ (কখনও কখনও এক তৃতীয়াংশ) লর্ড তাঁর নিজের হাতে রাখতেন। বলা বাহুল্য, সব চাইতে উর্বর জমিগুলিই তিনি নিজের ভাগে রাখতেন। স্বাধীন চাষী এবং সার্ফ উভয় শ্রেণীর লোককেই লর্ডের জমি চাষ করে দিতে হত। অবশ্য সার্ফরাই একাজে বেশী লিপ্ত থাকত।

জমির তিন ভাগ ঃ বদলে বদলে ফসল ফলানোর জন্য জমিকে তিনভাগে ভাগ করা হত। একভাগ জমিতে শীতের সময়, অপর ভাগ জমিতে বসন্তকালে ফসল ফলান হত। তৃতীয় ভাগ জমি পতিত থাকত। এ বছর যে জমিতে শীতকালে ফসল হত, পরের বছর সে জমি হয়ত বসন্তকালে চাষ করা হত বা পতিত রাখা হত। এভাবে বদলে বদলে ফসল ফলান হত। তাতে ফসল ভাল হত। ভাগে ভাগে জমি চাষ করার আর একটা সুবিধা ছিল, তাতে অপেক্ষাকৃত কম লাঙ্গলের প্রয়োজন হত।

জঙ্গল ও পশু চরানোর জমি ঃ চাষের জমি ছাড়াও পশু চরানোর জন্য আলাদা জমি থাকত। ম্যানোরের মধ্যে জঙ্গলও থাকত। তা থেকে রান্না ও ঘরবাড়ী তৈরীর জন্য কাঠ পাওয়া যেত। গ্রামের সব লোকই পশু চরানোর জায়গা ও গ্রামের জঙ্গল ব্যবহার করতে পারত।

স্বয়ংসম্পূর্ণতা ঃ প্রত্যেক ম্যানোরই নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিজেই তৈরী করত। নুন, লোহা প্রভৃতি দু'-একটি জিনিস ছাড়া বাইরে থেকে কিছু আমদানি করতে হত না। প্রত্যেক ম্যানোরেরই নিজস্ব ছুতোর, কামার ইত্যাদি থাকত।

নানা ধরনের কর ঃ লর্ড বা জমিদার সাধারণ লোকের কাছ থেকে

নানা রকমের কর আদায় করতেন। গরীব চাষীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসের ব্যবস্থা নিজেরা করে উঠতে পারত না। ম্যানোরের সকল লোকের জন্য লর্ড সে সব ব্যবস্থা করে দিতেন। যেমন বড় রুটি তৈরী করার জন্য বড় উনুন, পানীয় জলের জন্য কুয়ো, শস্য ভাঙ্গানোর জন্য মিল, মদ তৈরী করার ব্যবস্থা ইত্যাদি। লর্ডের তৈরী করা এসব জিনিস ব্যবহার করার জন্য ম্যানোরের লোকেদের কর দিতে হত। লর্ড-এর কর যোগাতে যোগাতে ফিউডেল যুগের লোকেরা ফতুর হয়ে যেত।

কর্মচারী : কর আদায় করা, জমির দেখাশুনা প্রভৃতি কাজের জন্য লর্ডকে বেশ কয়েকজন কর্মচারী রাখতে হত। এ ছাড়া ম্যানোরের লোকদেরও মিলিতভাবে কিছু কিছু কর্মচারী রাখতে হত। যেমন— গ্রামের পশু চরানোর জায়গা যাতে কেউ নিজের কাজে না লাগাতে পারে, তার জন্য একজন কর্মচারী রাখা হত ; তারপর গ্রামের গরু-বাছুর, ভেড়া, শূয়োর প্রভৃতি চরানোর জন্য গ্রামের লোকেরা মিলিত-ভাবে কাজের লোক রাখত।

গির্জা : সব ম্যানোরেই অন্ততঃ একটা করে গির্জা থাকত। গির্জার পাশেই থাকত ধর্মযাজকের বাড়ী। গির্জার জন্য আলাদা করে জমি থাকত। গ্রামের লোকেরাই সাধারণতঃ ঐ জমিতে চাষ করে দিত।

উত্তর করে শেখো

১। ম্যানোর কাকে বলে ? ফিউডেল প্রথার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি ?

২। ম্যানোরের জমির বিলি ব্যবস্থা ও চাষবাস কি করে হত নক্সা এঁকে দেখাও।

৩। ম্যানোরে সমবায় প্রথায় চাষবাস হত এ কথা বলতে কি বোঝ ব্যাখ্যা কর।

৪। ম্যানোরের সাধারণ লোকেরা করের ভারে কিভাবে পীড়িত হত ব্যাখ্যা কর।

৫। ম্যানোরের গির্জা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৬। ম্যানোরের কর্মচারীদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

উনত্রিংশ পাঠ

ম্যানোরে সাধারণ লোকের জীবন

সমাজে তিন শ্রেণীর লোক ঃ ফিউডেল যুগে সমাজের লোক তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল—অভিজাত সম্প্রদায়, ধর্মযাজক সম্প্রদায় ও সাধারণ লোক। সাধারণ লোককে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়—স্বাধীন চাষী ও সার্ফ বা ভূমিদাস। ওপরের তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিজাত সম্প্রদায় চাষীদের শোষণ করে প্রচুর টাকার মালিক হতেন। জমির খাজনা ছাড়াও তাঁরা নানাভাবে চাষীদের কাছ থেকে কর হিসাবে প্রচুর টাকা আদায় করতেন। ঐ টাকা দিয়ে তাঁরা বিলাসের জীবন কাটাতেন। তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতাও কম ছিল না। সব কিছুই তাদের হুকুম মত হত। ধর্মযাজকদেরও প্রচুর আয় ছিল। সাধারণ লোক তাঁদের জমিও চাষ করে দিত ও সবসময় তাঁদের আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকত। সাধারণ লোকের জীবন এ দু'-শ্রেণীর একেবারে বিপরীত ছিল—দুঃখে-কষ্টে তাদের দিন কাটতো।

সাধারণ চাষীর জীবন ঃ খড়ের চাল দেওয়া এক কোঠার বাড়ীতে যে সাধারণ চাষীরা থাকত সে কথা আগেই তোমাদের বলা হয়েছে। ঘরে ছিল একটামাত্র ছোট জানালা। তার উপর তেল মাখান মোটা পর্দা টাঙান থাকত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের পরিশ্রম করতে হত। কখনও নিজের জমিতে, কখনও বা লর্ডের জমিতে কখনও বা ধর্মযাজকের জমিতে তাদের খাটতে হত। স্ত্রীলোকেরাও দিনরাত খাটত। তারা অন্যান্য কাজ করেও চরকায় সুতো কাটত ও তাঁতে কাপড় তৈরী করত।

তাদের খাওয়া-দাওয়া খুব সাধারণ—শাক-সব্জি ও মোটা রুটি। ডিম বা মাংস খুব কমই জুটত। তাদের সম্পত্তির মধ্যে ছিল কয়েকটি শূয়োর, গাই, বলদ ও মুরগী—অনেকটা আমাদের চাষীদের মতই তাদের জীবন ছিল।

সাধারণ লোকেরা প্রতি রবিবার গির্জায় উপাসনা করতে যেত। সাধারণতঃ তারা ছিল ধর্মপ্রাণ।

ভূমিদাসদের জীবন ঃ ভূমিদাসদের জীবন আরও কঠোর ছিল। গরু-ছাগলের মত তারা লর্ডদের সম্পত্তি বলে গণ্য হত। গরু-ছাগলের মতই তাদের বিক্রী করা যেত। অনেক সময় একজন ভূমিদাসের দাম একটা ভাল ঘোড়ার দামের চেয়ে কম হত। লর্ড ভূমিদাসদের অবশ্য

চাষ করার জন্য জমি দিতেন। তা থেকেই তাদের খাওয়া পরা চলত। কিন্তু জমি ছেড়ে ইচ্ছেমত কোথাও তারা যেতে পারত না। যে কোন কাজের জন্য ডাকলেই তাদের লর্ডের বাড়ীতে উপস্থিত হতে হত। তাদের সন্তানদেরও লর্ডের বাড়ীর সবরকম ঘরের কাজ করে দিতে হত।

লর্ড ও স্বাধীন চাষীরা ভূমিদাসদের ওপর অন্যায় অত্যাচার করলেও আদালতে তার কোন বিচার হত না। একমাত্র এক ভূমিদাস অপর ভূমিদাসের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার চাইতে পারত।

তাদের বিয়ে করার স্বাধীনতা ছিল না। বিয়ে করতে হলে লর্ডের অনুমতি নিতে হত। ম্যানোরের বাইরের কাউকে বিয়ে করতে দিতে লর্ড সহজে অনুমতি দিতেন না।

ভূমিদাসদের একটামাত্র সুবিধা ছিল যে তাদের জমি কেড়ে নেওয়া যেত না। ম্যানোর যদি বিক্রী হয়ে যেত তবে ভূমিদাসরাও তার সঙ্গে বিক্রী হয়ে যেত। তাদের জমি তাদের হাতেই থাকত।

এ অসহ্য অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কখনও কখনও ভূমিদাসেরা বিদ্রোহ করত। কিন্তু ফল কিছু হত না। একমাত্র মুক্তির পথ ছিল খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ায়। কখনও কখনও তারা পালিয়ে শহরে চলে যেত। সেখানে কোন বড় ব্যবসায়ী হয়ত তাদের আশ্রয় দিত। অবশ্য তাদের খাটতে হত তার কলকারখানায়।

উত্তর করে লেখো

১। বামদিকে মধ্যযুগের চার শ্রেণীর লোকের নাম দেওয়া হল, আর ডানদিকে, তাদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি বাক্যাংশ দেওয়া হল। যে বাক্যাংশ যে যে শ্রেণীর লোকের জীবন সম্বন্ধে দেওয়া হয়েছে, তাহা বোঝাবার জন্য সেই শ্রেণীর বামদিকের সংখ্যা, বাক্যাংশগুলির ডান দিকে বসাও। কোন বাক্যাংশ যদি কোন শ্রেণী সম্বন্ধে সত্য না হয় তবে তার ডান দিকে ক্রস (×) চিহ্ন দাও। কোন বাক্যাংশ যদি একাধিক শ্রেণী সম্বন্ধে প্রয়োগ হয় তবে তার ডান দিকে একাধিক সংখ্যা বসতে পারে।

১। লর্ড ২। ধর্মযাজক ৩। স্বাধীন চাষী ৪। ভূমিদাস।	জমি ছেড়ে যেতে পারত না ( ) বিয়ে করতে অনুমতি নিতে হত ( ) খড়ের চালের ঘর ছিল ( ) প্রচুর টাকার মালিক ( ) সাধারণ খাওয়া-দাওয়া ( ) স্বেচ্ছাচারী ছিলেন ( ) লর্ডের বাড়ীর সবরকম কাজ করে দিতে হত ( ) দিনরাত পরিশ্রম করতে হত ( ) সন্ন্যাসী হয়েছে ( )।

২। মধ্যযুগে ভূমিদাসদের জীবন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

ত্রিংশ পাঠ

ক্রুসেড

ক্রুসেড ঃ প্রায় দু'শো বছর ধরে, (১০৯৪ থেকে ১২৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ইউরোপের খ্রীষ্টানরা মধ্য-এশিয়ায় আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। এই দুশো বছরব্যাপী যুদ্ধকে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ বলা হয়। ইউরোপের সমাজে এ যুদ্ধ বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। দেশের সব শ্রেণীর লোক, রাজা, সামন্ত, যাজক, বণিক, চাষী, সৈনিক এমনকি চোর-দস্যুও এ যুদ্ধে স্বেচ্ছায় যোগ দেয়।

নামকরণ ঃ "ক্রুসেড" কথাটা স্প্যানিশ ভাষা থেকে এসেছে। ক্রুসেডের সৈনিকদের পতাকা ও পরিচ্ছদ ক্রস চিহ্নিত থাকত বলে, যুদ্ধের নাম হয় ক্রুসেড। তোমরা জান যে যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুসে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল। তাই ক্রুস খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতীক।

খ্রীষ্টান তীর্থ জেরুজালেম ঃ বাইরে থেকে দেখলে মুসলমানদের হাত থেকে খ্রীষ্টান তীর্থ জেরুজালেম উদ্ধার করার জন্যই ক্রুসেড আরম্ভ হয়। যীশুর জন্মস্থান, কর্মস্থান ও সমাধিক্ষেত্র হল প্যালেষ্টাইন রাজ্যের অন্তর্গত জেরুজালেম নগরে। মক্কা যেমন তীর্থস্থান—প্রতি বছরই তেমনি বহু লোক তীর্থ করতে ইউরোপ থেকে জেরুজালেমে যেত।

খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের উপর অত্যাচার ঃ মহম্মদের মৃত্যুর পরই (সপ্তম শতকে) জেরুজালেম মুসলমানরা দখল করে। কিন্তু তারা খ্রীষ্টানদের ধর্মাচরণে বাধা দিত না। ১০৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী মুসলমানরা জেরুজালেম অধিকার করে। তারপরই খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের ওপর আরম্ভ হয় অত্যাচার। তীর্থযাত্রীরা ইউরোপে ফিরে তাঁদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী প্রচার করেন। শেষ পর্যন্ত পিটার নামে এক ফরাসী খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী পোপের কাছে এসে খ্রীষ্টানদের এ অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে আবেদন জানান। পোপ তখন ইউরোপের সকল খ্রীষ্টানকে শ্রেণী নির্বিশেষে ধর্মযুদ্ধ করে জেরুজালেমকে মুসলমান-দের হাত থেকে উদ্ধার করার আহ্বান জানান। পিটার খালি পায়ে ফ্রান্সের গ্রামে, শহরে ঘুরে ঘুরে খ্রীষ্টানদের ওপর মুসলমানদের সত্য, অর্ধসত্য, অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টানদের উত্তেজিত করে তোলেন। পোপের আহ্বানে অনেক খ্রীষ্টান সাড়া দেন। আরম্ভ হয় ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ।

অন্যান্য কারণ ঃ জেরুজালেম খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার ছাড়াও ক্রুসেডের আরও কতকগুলি কারণ দেখা যায়। মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেকদিন থেকেই ইউরোপের লোকের মনের ভাব মধুর নয়। মুসলমানেরা স্পেন দখল করে এবং তারা ভূমধ্যসাগরের ভেতর দিয়ে ইউরোপের বাণিজ্যের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ধর্মযুদ্ধের ভেতর দিয়ে মুসলমান শক্তিকে ধ্বংস করা ইউরোপের লোকের আসল উদ্দেশ্য।

এতদিন ইউরোপের বাইরে বেশী লোক খ্রীষ্টধর্ম নেয়নি। পোপ দেখলেন যে ক্রুসেডের ভিতর দিয়ে প্রাচ্যদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের এক বড় সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। তাই তিনি সকলকে ক্রুসেডে যোগ দিতে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তোমরা জান নাইটরা সব সময়ই দুঃসাহসিক কাজের সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকেন। ক্রুসেড তাঁদের কাছে সাহসিকতা দেখানোর বড় সুযোগ এনে দিল। তাঁরা দলে দলে ক্রুসেডে যোগ দিলেন।

উত্তর করে শেখো

১। ক্রুসেড কাকে বলে? ক্রুসেড নামকরণ কেন হয়েছিল?

২। খ্রীষ্টানদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচার ছাড়া ক্রুসেডের আর কি কি কারণ ছিল?

একত্রিংশ পাঠ

প্রথম, তৃতীয় ও…ক্রুসেড

ক্রুসেডের সংখ্যা ঃ মোট সাতটি বড় ক্রুসেড হয়। এছাড়া ছোট ছোট ক্রুসেড হয় আরও অনেক। ইউরোপেও মুসলমানদের তাড়াবার জন্য ক্রুসেড হয়।

প্রথম ক্রুসেড ঃ প্রথম ক্রুসেডে ইউরোপের রাজাদের মধ্যেই কেউই যোগ দেননি। ফ্রান্সের সামন্তরাই বেশী করে ক্রুসেডে যোগ দেন, তাঁদের অধীনের সৈন্যদের নিয়ে। এছাড়া নাইটরাও ছিলেন সংখ্যায় প্রচুর। মুসলমানেরা ক্রুসেডারদের তেমন কিছু বাধা দিতে পারেনি।

ক্রুসেডারেরা জেরুজালেম দখল করে সেখানে খৃষ্টানদের এক রাজ্য স্থাপন করে। এছাড়া জেরুজালেমের কাছে আক্কার নগরে তারা একটি উপনিবেশ ও সৈন্যাবাস স্থাপন করে।

তৃতীয় ক্রুসেড ঃ দ্বিতীয় ক্রুসেড তেমন কিছু সফলতা অর্জন করতে

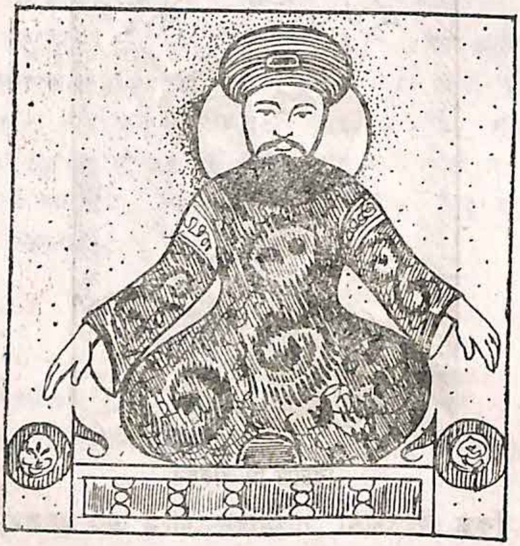


রিচার্ড দি লাইয়ন

পারেনি। কিন্তু ইতিমধ্যে সালাদিন নামে এক মুসলমান বীর মিশর ও সিরিয়া অধিকার করে খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে জেরুজালেম জয় করে নেন। সালাদিন জন্মে কুর্দিস্থানী, ধর্মে মুসলিম, শৌর্যে অপরাজেয়, চরিত্রে মহান এক বীর। তৃতীয় বারের ক্রুসেডে ফ্রান্স, জার্মানী ও ইংলণ্ডের রাজারাও যোগ দেন। ইংলণ্ডের রাজার নাম ছিল রিচার্ড। বয়স মাত্র ২৩ বছর হলেও তিনি খুব সাহসী ও বড় যোদ্ধা ছিলেন। জার্মানীর সম্রাট বারবারোসো পথে জলে ডুবে প্রাণ হারান। ফ্রান্সের রাজা রিচার্ডের সঙ্গে ঝগড়া করে দেশে ফিরে যান। রিচার্ডের নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা আক্কার নগর আবার অধিকার করে নিল। জেরুজালেম কিন্তু মুসলমানদের হাতেই রয়ে গেল। রিচার্ড সালাদিনের সঙ্গে সন্ধি করে নিজ দেশে ফিরে গেলেন।

চতুর্থ ক্রুসেড ঃ জেরুজালেম উদ্ধার না হওয়ায় আবার ক্রুসেড করার প্রয়োজন হয়। প্রথম ক্রুসেডের মত এ ক্রুসেডেও ফ্রান্সের সামন্তেরা ও নাইটরা প্রধানভাবে যোগ দেন। কিন্তু এ ক্রুসেড প্রমাণ

করে যে ধর্মযুদ্ধের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করাই ক্রুসেডারদের মূল উদ্দেশ্য। ইটালির ভেনিস শহর তখন সমুদ্রপথে ব্যবসায়ে অগ্রণী। টাকার বিনিময়ে ভেনিস ক্রুসেডারদের সমুদ্রপথে যাত্রার ব্যবস্থা করে দিতে রাজী হয়। ভেনিসের প্ররোচনায় ক্রুসেডাররা ভেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বী "জারা" শহরকে ধ্বংস করে। "জারা" খ্রীষ্টান শহর। পোপ এতে ভীষণ রেগে গেলেন। কিন্তু ক্রুসেডাররা তা গ্রাহ্য করল না।



সালাদিন

তখন আবার কনস্টান্টিনোপলের সিংহাসন নিয়ে বিবাদ চলছে। বিবাদীর এক পক্ষ সমর্থন করে ক্রুসেডাররা কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ করে ধ্বংস করে এবং সেখানে ল্যাটিন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই গ্রীকরা আবার তাদের সাম্রাজ্য উদ্ধার করে।

চতুর্থ ক্রুসেডের পর আর কোন ক্রুসেড জোরদার হয়নি। জেরুজালেম উদ্ধার না করেই ক্রুসেডের অবসান হয়ে যায়।

উত্তর করে লেখো

১। নীচের বাক্যাংশ বা নামের মধ্যে কোন্‌টি ১ম, কোন্‌টি ৩য় ও কোন্‌টি ৪র্থ ক্রুসেডের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত তা বোঝানোর জন্য তাদের ডানদিকে ১, ৩ ও ৪ সংখ্যা লেখ—রিচার্ড ( ) সালাদিন ( ) আক্কারে উপনিবেশ ( ) জারা ধ্বংস ( ) জেরুজালেম উদ্ধার ( ) ইউরোপের রাজাদের যোগদান ( ) আক্কার পুনরুদ্ধার ( )।

দ্বাত্রিংশ পাঠ

ক্রুসেডের ফলাফল

ক্রুসেডের বিফলতা ঃ ক্রুসেড দু'শো বছরেরও ওপরের যুদ্ধ। ইউরোপের প্রায় সব রাজ্যের সব শ্রেণীর লোক তাতে যোগ দেয়। ধর্মের জন্য প্রাণদানের উন্মাদনাও তাতে বড় কম ছিল না। তবু যে উদ্দেশ্যে ক্রুসেড আরম্ভ হয় তা কিন্তু সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টানদের সর্বপ্রধান তীর্থ জেরুজালেম মুসলমানদের হাতেই রয়ে গেল।

বিফলতার কারণ ঃ ক্রুসেডের বিফলতার প্রথম কারণ হল তার নেতাদের মধ্যে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ঝগড়া-ঝাটি। বিফলতার দ্বিতীয় কারণ হল যে, ক্রুসেডাররা একজন নেতার অধীনে ছিল না। তারা ভিন্ন ভিন্ন নেতার অধীনে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে থাকতেন। তারপর জেরুজালেম উদ্ধার করা অনেক ক্রুসেডারেরই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তোমরা দেখেছ, চতুর্থ ক্রুসেডে, ক্রুসেডাররা খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করতে শুরু করে।

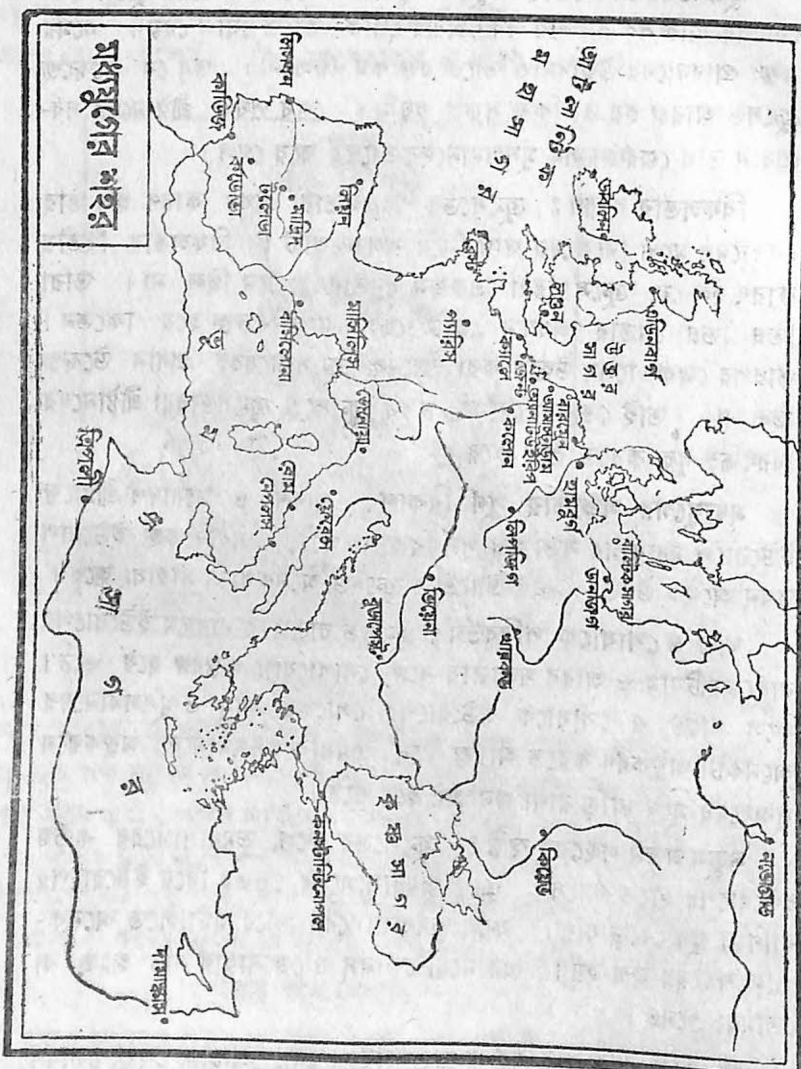
মধ্যযুগের সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ; দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে মধ্যযুগের সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সবদিকেই ইউরোপ তখন অনেক উন্নত। এই উন্নতিতে ক্রুসেড অনেকখানি সাহায্য করে।

খাদ্য ও পোষাকে পরিবর্তন ঃ ক্রুসেড যাত্রাদের মাধ্যমে ইউরোপের বাইজেনটিয়াম ও আরব সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। ফলে খাদ্যে ও পোষাকে ইউরোপের লোকেরা গ্রীক্ ও মুসলমানদের অনেকটা অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। এমনকি মুসলমানদের অনুকরণে পুরুষদের মুখে দাড়ি রাখা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

নতুন নতুন শহরের সৃষ্টি ঃ ক্রুসেডের ফলে, ভূমধ্যসাগরের কর্তৃত্ব ইউরোপের হাতে আসে। এতে ভূমধ্যসাগরের ভেতর দিয়ে ইউরোপের বাণিজ্য খুব বেড়ে যায়। ফলে ভূমধ্যসাগরের তীরে ইটালিতে অনেকগুলি শহরের জন্ম হয়। এর মধ্যে ভেনিস্ ও জেনোয়ার নাম হয়ত বা তোমরা শুনেছ।

দূর থেকে মধ্যযুগের এই শহরগুলোর পরিখা, প্রাচীর, সেতু, তোরণ ও অট্টালিকাগুলিকে দেখতে সুন্দর বলে মনে হলেও আসলে এর রূপ কিন্তু অন্যরকম। শহরের পথগুলো সরু, আঁকাবাঁকা। রাতের বেলায় পথগুলো অন্ধকার হয়ে থাকে। এছাড়া শহরের আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর।

জলাশয় ও কূপগুলো প্রায়ই দূষিত থাকে, ফলে রোগ ও মহামারী প্রায়ই লেগে থাকে। মধ্যযুগের শহরে সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন হাট বা বাজার বসে। হাট ছাড়া অনেক শহরে বছরে একবার বা দু'বার মেলা বসে।



মধ্যযুগের শেষদিকে শহরগুলো রাজা বা সামন্তদের কাছ থেকে নানারকম অধিকার লাভ করে। ঐসব অধিকার একটি সনদে লেখা থাকে। এতে নাগরিক কর বা শুল্কের পরিমাণ, পৌরসভা গঠন ব্যবস্থা

ইত্যাদির বিষয় লেখা থাকে। রোম, বার্লিন, লণ্ডন, প্যারিস ও রিগজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে স্বায়ত্ব-শাসন ব্যবস্থার প্রচলন হয়। নাগরিকেরা কখনও কখনও বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করে, মুদ্রা প্রচলন করে এবং শুল্কের পরিমাণ স্থির করে। এমনি করে ইতালীর ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, মিলান, জার্মানীর ল্যুবেক, হাম্‌বুর্গ প্রভৃতি নগর প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

কুটির-শিল্পের উন্নতি ঃ বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে ইউরোপের কুটির-শিল্পের উন্নতি ঘটে। প্রাচ্যদেশে প্রস্তুত জিনিষের ভাল দর পাওয়ায় শিল্পীদের মধ্যে উৎসাহের জোয়ারের সৃষ্টি হয়। এই সময়কার কুটির-শিল্পগুলি শহরে গড়ে ওঠে। গ্রাম ও চাষবাসের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ছিল না। এখন শহরে যে সব বড় বড় শিল্প দেখ তার ভিত্তি ঐ কুটির-শিল্প।

বুর্জোয়া শব্দের সৃষ্টি ঃ আজকাল রাস্তাঘাটে "বুর্জোয়া" শব্দটি প্রায়ই শোনা যায়। তোমরা হয়ত, তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কাউকে বুর্জোয়া বলে টিটকারী দিয়ে থাক। বুর্জোয়া বলতে, আমাদের মনে এমন লোকের ছবি ফুটে ওঠে, যে হয়ত জনসাধারণ থেকে নিজেকে একটু স্বতন্ত্রভাবে থাকে, আর যার চলায়, বলায়, আচারে অহঙ্কার ফুটে ওঠে ; আর হয়তো বা তার আর্থিক স্বচ্ছলতাও বেশী। "বুর্জোয়া" ফরাসী ভাষার শব্দ। আসলে ক্রুসেডের সময় শহরে যে ধনীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, তাদের "বুর্জোয়া" বলা হত। তাই থেকেই বুর্জোয়া শব্দের সৃষ্টি।

যুদ্ধবিত্তায় উন্নতি ঃ গ্রীক ও মুসলমানদের কাছ থেকে ক্রুসেডাররা তুর্গ তৈরী ও যুদ্ধ করার নতুন নতুন কৌশল ও নতুন নতুন অস্ত্র ব্যবহার করতে শেখে।

ইতিহাস ও কবিতা লেখায় উৎসাহ ঃ ক্রুসেডের বিবরণ লিখতে গিয়ে, ইতিহাস রচনার উৎসাহ পাওয়া যায়। ক্রুসেডাররা প্রাচ্যদেশের নানা রকমের গল্প জেনে এসে দেশে সে সব প্রচার করে। এতে ইউরোপের কবিদের কল্পনার খোরাক মেলে।

নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের উৎসাহ ঃ ক্রুসেডের ফলে ইউরোপের লোকেরা দেশভ্রমণে উৎসাহিত হয়। অজানা দেশ আবিষ্কারের দিকেও তাদের ঝোঁকের সৃষ্টি হয়।

খৃষ্টধর্মের বিস্তার ঃ তোমরা জান যে, বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই খ্রীষ্টধর্মের লোক আছে। ক্রুসেডের সময় খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরা ইউরোপের বাইরে গিয়ে ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। তাঁদের এ চেষ্টা ধীরে ধীরে

জোরদার হয়। ফলে পৃথিবীর সব জায়গায় খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরা ছড়িয়ে পড়েন।

পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধি ঃ ক্রুসেডের ফলে পোপের মান, মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাঁরই আহ্বানে ইউরোপের সব লোক জেরুজালেম উদ্ধারে ছুটে যায়। সকলেই তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয়।

উত্তর করে শেখো

১। ক্রুসেডের ফলাফল সম্বন্ধে একটি রচনা লেখ।

ত্রয়োত্রিংশ পাঠ

চীনদেশে তাং সম্রাটদের শাসন

মধ্যযুগে চীন ঃ চীনদেশের প্রাচীনকালের ইতিহাস তোমরা পড়েছ। এবার আমরা মধ্যযুগে চীনদেশের কথা পড়ব। চীনদেশ যে আমাদের দেশ থেকে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত তাও তোমরা জান। মানচিত্রে চীনদেশ কোথায় এবং সেটা যে একটা খুব বড় দেশ, তা দেখে নিও।

তোমরা ইউরোপ ও ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস পড়েছ। তা থেকে জেনেছ যে এই দুই জায়গায় প্রাচীনকালে সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে; কিন্তু মধ্যযুগে এদের সভ্যতা এগিয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। চীনদেশেরও প্রাচীন সভ্যতা খুব উন্নত। কিন্তু ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মত মধ্যযুগে চীনের সভ্যতা নীচু মানের হয়ে পড়েনি। ফলে মধ্যযুগেও চীনের সভ্যতা সমানভাবে এগিয়ে চলে।

চীনদেশে মধ্যযুগের সময়-সীমা ঃ মোটামুটিভাবে চীনদেশে ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যযুগের আরম্ভ ও ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে তার শেষ ধরা হয়। মোটামুটিভাবে এই ৬৬২ বছর চীনদেশের ইতিহাসকে আমরা মধ্যযুগ বলতে পারি।

তাং-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঃ সুই বংশের পতনের পর তাং বংশ ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রাচীনকালে চীন

দেশের উত্তরাংশ নিয়েই চীনের সভ্যতা প্রধানতঃ গড়ে উঠে। তাং বংশ ও চীনের উত্তরাংশ নিয়েই তাঁদের সাম্রাজ্য গঠন করেন।

তাং তাই স্থং ঃ তাং তাই স্থং ছিলেন তাং বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর বাবা কা ওৎ-সুং তাঁরই সাহায্যে ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে তাং বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। নয় বছর রাজত্ব করার পর তিনি ছেলের হাতে সিংহাসন দিয়ে অবসর নেন। তাং তাই সুং ২৩ বছর রাজত্ব করেন।

রাজ্যবিস্তার ঃ তাং তাই স্থং মধ্যএশিয়ার অনেক দেশ জয় করে দেশের বাইরেও চীন সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটান। ঐ স্থানের তুর্কী অধিবাসীরা তাং তাই স্থং-এর বশ্যতা স্বীকার করে। এভাবে গোবি মরুভূমি পর্যন্ত চীন প্রাধান্য লাভ করে। পূর্ব মঙ্গোলিয়ার মঙ্গোলদেরও তাং তাই স্থং জয় করেন।

শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার ঃ তাং তাই সুং নানাভাবে শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করেন।

কা ও স্থং ঃ তাং তাই স্থং-এর পর তাঁর ছেলে কা ও স্থং সম্রাট হন। তিনি প্রায় ৩৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি কোরিয়া রাজ্যের অনেক অংশ জয় করেন। ভারতবর্ষের সীমানার খুব কাছে ইক্ষু নদী পর্যন্ত তাঁর প্রাধান্য বিস্তার ঘটে। কা ও স্থং বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন।

উ হৌ ঃ এই সময় চীনের ইতিহাসে উ হৌ নামে এক মহিলার কথা কিছু বলতে হয়। সম্রাট কা ও স্থং-এর ওপর তাঁর বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। সম্রাটের রাজত্বের শেষ সময় উ হৌ-ই প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য চালান। কা ও স্থং-এর মৃত্যুর পর প্রায় ২২ বছর তিনিই সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেন। তাঁর ইচ্ছামত লোককে সিংহাসনে বসান হয়। তারা তাঁর হাতের পুতুলের মত কাজ করেন। প্রায় ৮০ বছর বয়সে এক ষড়যন্ত্রের ফলে উ হৌ ক্ষমতাচ্যুত হন।

সিং হোয়াং ঃ সিং হোয়াং ছিলেন তাং বংশের আর একজন প্রতাপশালী রাজা। তিনি ৭১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর রাজত্বকালে তিব্বত খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অপরদিকে আরব মুসলমানেরাও মধ্য-এশিয়ায় তাদের শক্তি বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ করে। সিং হোয়াং তিব্বত ও আরব মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে চীনের সাম্রাজ্য রক্ষায় সক্ষম হন।

সিং হোয়াং-এর রাজত্বকালে কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট উন্নতি ঘটে।

তাং বংশের পতন : সিং হোয়াং-এর পর তাং বংশের পতন আরম্ভ হয়। তাং সম্রাট-এরই একজন সেনাপতি চু ওয়েন ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে শেষ তাং সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

উত্তর করে লেখো

১। ইউরোপ ও ভারতবর্ষ এবং চীনদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য কি তা লেখ।

২। তাং বংশ সব স্বদ্ধ কত বছর রাজত্ব করেন তা লেখ।

৩। তাং বংশের তিনজন প্রধান সম্রাটের নাম লেখ এবং প্রত্যেক নামের পাশে ঐ সম্রাট কত বছর রাজত্ব করেছিলেন লেখ।

৪। মানচিত্রে নীচের নামগুলি চিহ্নিত কর—গোবি মরুভূমি, ইক্ষু নদী, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া।

চতুর্স্ত্রিংশ পাঠ

তাং শাসনকালে প্রশাসন, আইন-কানুন ও শিক্ষা

তাং শাসনকাল : ৬১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই তিনশো বছরের কিছু কম সময় তাং সম্রাটগণ চীনদেশ শাসন করেন। এই বংশের তিনজন প্রধান সম্রাট একশ' বছরেরও বেশী সময় রাজত্ব করেন। ক্ষমতাশালী ও কৃতী সম্রাটদের শাসনকালেই চীনে সভ্যতার সকল দিক থেকে উন্নতি ঘটে।

সৈন্যবাহিনীর আধুনিকীকরণ : সৈন্যবাহিনীর ওপরই বিশেষ করে সম্রাটের ক্ষমতা নির্ভর করে। তাং সম্রাটগণ সৈন্যবাহিনীর জন্য নতুন ও উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র প্রবর্তন করেন। সৈন্যবাহিনীতে বিশেষ করে অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানো হয়।

সাম্রাজ্যকে ছোট ছোট বিভাগে বিভক্তিকরণ : বড় দেশ বা সাম্রাজ্যের প্রশাসনকে ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত করে শাসন করলেই শাসন-ব্যবস্থা জোরদার হয়। ধর, আমাদের দেশ—প্রথম কতকগুলি রাজ্যে বিভক্ত রয়েছে। রাজ্যগুলি জেলায় এবং জেলাগুলি গ্রামে বিভক্ত রয়েছে। ঠিক সে রকম, তাংদের সময় চীন দেশ দশটি তাও

বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তাওগুলি আবার চৌ বা জেলায় বিভক্ত ছিল। চৌ এর পর ছিল হিয়েন। প্রত্যেক ভাগই যাতে ভালভাবে শাসিত হয়, তার জন্য ছিল উপযুক্ত রাজকর্মচারী। নীচের নক্সাটি দেখ—

সাম্রাজ্য
|
তাও
|
চৌ
|
হিয়েন

শাসন-ব্যবস্থায় সম্রাটের প্রাধান্য ঃ তাও প্রভৃতি প্রশাসনের ছোট ছোট বিভাগগুলি যাতে স্বেচ্ছাচারী না হয়ে উঠতে পারে তার দিকে সম্রাট দৃষ্টি দিতেন। যত রাজকর্মচারী ছিলেন তাঁরা সকলেই সম্রাটের দ্বারা নিযুক্ত হতেন এবং সম্রাটের আদেশ শুনতে বাধ্য থাকতেন।

রাজকর্মচারীগণ ঃ চীনদেশের শাসনের মেরুদণ্ড হলেন রাজ-কর্মচারীগণ। উপযুক্ত লোক যাতে রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত হতে পারেন তার জন্য সরকার, এখনকার মতই উপযুক্ত পরীক্ষা নিয়ে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করতেন। রাজকর্মচারীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ বিদ্যালয় ছিল। কনফিউসাসের নীতি মেনে রাজকার্য পরিচালনার জন্য রাজকর্মচারীদের নীতি-শিক্ষা দেওয়া হত। চীনদেশের রাজ-কর্মচারীদের শিক্ষা, পরীক্ষা-ব্যবস্থা এবং তাদের দক্ষতা ও আচার-ব্যবহার পৃথিবীর অনুকরণীয় ছিল।

সরকারী শস্যভাণ্ডার ঃ আর একটা বিষয়ে চীনদেশের প্রশাসন আমাদের আধুনিককালের সমপর্যায় ছিল। তা হল উদ্বৃত্ত ফসলের সময় সরকারী শস্যভাণ্ডার গঠন করে দুর্ভিক্ষের সময় তা থেকে গরীবদের শস্য বিতরণ করা। বর্তমানে আমাদের দেশে যে এ ধরনের প্রচুর শস্যভাণ্ডার আছে তা তোমরা সবাই জান।

আইন-কানুন ঃ চীনদেশে আইনকে "লি" বলা হত। এছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষের মত দীর্ঘদিনের প্রচলিত প্রথাকেও চীনদেশে "লি" বলা হত। চীনবাসীরা বিশ্বাস করত যে এই প্রথাগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই প্রচলিত। তাই সকল মানুষকেই তা মেনে চলতে হয়। কেউ প্রচলিত প্রথাকে না মানলে, সমাজের সকলে মিলে তাকে তা

মেনে চলতে বাধ্য করত। চীনদেশে কনফিউসাসের শিক্ষার ফলে ন্যায়-নীতির মান এমন উঁচুতে ওঠে এবং প্রথাগুলিকে সকলে এমনভাবে মেনে চলত যে আলাদা করে কিছু কিছু আইন থাকলেও তার প্রয়োগের খুব বেশী প্রয়োজন হত না।

শিক্ষা ঃ তাং সম্রাটদের শাসনকালে রাজকর্মচারীদের শিক্ষার জন্য যে বিশেষ বিদ্যালয় ছিল তা তোমাদের আগে বলা হয়েছে। শিক্ষা শেষে সরকার পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। যাঁরা পরীক্ষায় কৃতকার্য হতেন তাঁদের এখনকার মতই সনদ দেওয়া হত।

রাজকর্মচারী ছাড়া বৌদ্ধ ধর্মযাজক হওয়ার জন্যও শিক্ষা দেওয়া হত। এ ছাড়া বৌদ্ধ মঠগুলিতে ঐ শিক্ষা দেওয়া হত।

রাজকর্মচারী ও বৌদ্ধ ধর্মযাজক ছাড়া, সাধারণ লোকের শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। চাষবাস ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা শিক্ষানবিশী হয়ে নিতে হত।

উত্তর করে শেখো

১। তাং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের কোন্‌টি ছোট কোন্‌টি বড় তা বোঝাবার জন্য তাদের নামসহ একটি নক্সা আঁক।

২। তাং সাম্রাজ্যের রাজকর্মচারীদের শিক্ষা ও পরীক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। চীনদেশের আইন-কানুন ও শিক্ষা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

পঞ্চত্রিংশ পাঠ

তাং শাসনকালে ব্যবসা-বাণিজ্য বৌদ্ধধর্ম ও বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক

সভ্যতার বিকাশের দুটি প্রধান কারণ : ইতিহাস পড়লে আমরা দেখি যে কোন দেশে যখন সভ্যতার তাড়াতাড়ি বিকাশ ঘটে শক্তিশালী সুশাসনের ফলে সে দেশে তখন শান্তি বিরাজ করে। আবার এও দেখি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তখন সে দেশে আর্থিক স্বচ্ছলতার সৃষ্টি হয়। তাই শক্তিশালী সুশাসন ও আর্থিক স্বচ্ছলতাকে আমরা সভ্যতা বিকাশের কারণ বলে ধরতে পারি।

উত্তর ও দক্ষিণদিকে স্থল ও জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য : তাং সম্রাটদের শাসনকালে দেশে শান্তি ছিল, একথা তোমরা আগেই পড়েছ। তাঁদের শাসনকালে চীনদেশ ব্যবসা-বাণিজ্যেও খুব উন্নতি করে। মধ্য এশিয়ায় তাং সম্রাটদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পশ্চিম-দিকের স্থলপথে চীনদেশের সঙ্গে অনেক দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতে থাকে। চীনের দক্ষিণে রয়েছে কয়েকটি বন্দর। তাদের মধ্যে প্রধান হল ক্যান্টন। ক্যান্টন বন্দর দিয়ে আরব, পারসিক ও ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চীনের সঙ্গে ব্যবসা চালাতেন। চীন বিশেষ করে সিল্কের কাপড়, মশলা প্রভৃতি বিদেশে পাঠাত। বিদেশ থেকে চীনে আসত হাতির দাঁত, কচ্ছপের খোল প্রভৃতি। আরব ব্যবসায়ীরা সম্ভবতঃ নিগ্রো দাসদের চীনে এনে বিক্রয় করত। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য তাং সম্রাটদের সময় চীনের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ খুব ভাল থাকে।

বিদেশীদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে নতুন ধর্মের প্রবেশ : তাং বংশের শাসনকালে চীনে প্রথম খ্রীষ্টধর্ম প্রবেশ করে। মধ্য এশিয়া থেকে এই ধর্ম চীন দেশে আসে। তাং বংশের শাসনকালে চীনদেশে যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর লোক ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে। বৌদ্ধধর্ম চীন দেশে আগে থেকেই ছিল। তাং সম্রাটদের শাসনকালে তা বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৌদ্ধধর্মের ভেতর দিয়ে ভারতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগাযোগ : তাং সম্রাটদের শাসনকালে, বেশ কয়েকজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারত ভ্রমণে আসেন। আবার বেশ কিছু ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীনদেশে গিয়ে ধর্ম প্রচারের কাজে ব্রতী হন।

হিউয়েন সাং : এদের মধ্যে হিউয়েন সাং-এর কথা তোমরা পড়েছ। হিউয়েন সাং ছিলেন একজন উচ্চ রাজকর্মচারীর ছেলে। তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে যান। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জানার আকাঙ্ক্ষা ছিল খুব প্রবল। তাই সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য করে ও অনেক কষ্টে স্থলপথে দীর্ঘদিন ভ্রমণের পর তিনি ভারতবর্ষে পৌছান। দীর্ঘ ১৪ বছর যে তিনি ভারতবর্ষে থাকেন তা তোমরা পড়েছ। ভারতবর্ষ থেকে তিনি অনেক বই নিয়ে যান। দেশে ফিরে তিনি আরও ২০ বছর বেঁচে থাকেন। এই সময় তিনি চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সঙ্গে নিয়ে আসা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করেন।


হিউয়েন সাং

তাং সম্রাটদের শাসনকালে ই সিং নামে আর এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও ভারতবর্ষে আসেন। অপরদিকে ভারতবর্ষ থেকেও কিছু কিছু সন্ন্যাসী ধর্মপ্রচারের জন্য চীনদেশে যান।

বৌদ্ধধর্মের প্রভাব : তাং সম্রাটদের অনেকেই বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়কার সব চাইতে প্রভাবশালী উ হৌ যাঁর কথায় একাধিক তাং সম্রাট উঠতেন বসতেন, নিজে ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী। রাজ ক্ষমতাকে সহায় পেয়ে তাং সম্রাটদের শাসনকালে চীনে বৌদ্ধধর্মের শাসন চরমে পৌঁছায়। বৌদ্ধ মঠ মন্দিরে চীনদেশ ছেয়ে যায়। ফলে বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান লোকের প্রতিদিনকার জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা : বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা চীনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বৃদ্ধি করেন। ভারতবর্ষ তখন গণিত ও জ্যোতিবিদ্যায় অগ্রণী। ভারতীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ যে চীনে যান, তা তোমাদের বলা হয়েছে। তাঁরা চীনদেশে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যাচর্চার প্রচলন করেন।

কোরিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ : ম্যাপে কোরিয়া জায়গাটা দেখে নিও। কোরিয়া চীনের পড়শী-রাজ্য। দ্বিতীয় তাং সম্রাট তাই সুং

কোরিয়া জয় করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু তাঁর ছেলে কাও স্যুং কোরিয়ার অধিকাংশ জয় করতে সমর্থ হন। কোরিয়ার ওপর চীনের অধিকার অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। রাজ্য জয় অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের ভেতর দিয়ে চীনের প্রভাব কোরিয়ায় বেশী করে পড়ে তোমরা হয়ত জান আজও পর্যন্ত চীন কোরিয়ার ওপরও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে চলেছে। কোরিয়া এখন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। চীনের প্রভাবের অধীনে রয়েছে উত্তর কোরিয়া। দক্ষিণ কোরিয়া আবার আমেরিকার প্রভাবে গিয়ে পড়েছে।

জাপানের সঙ্গে যোগাযোগ : জাপান চীনের পড়শী রাজ্য। চীনের কোরিয়া অধিকারের পর জাপানের সঙ্গে তার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়। জাপানের একাধিক দূত চীনদেশে আসে। চীনদেশের অনেক লোক জাপানে বসবাস করতে শুরু করে। চীনের সভ্যতা তখন জাপানের সভ্যতার চেয়ে অনেক উঁচু দরের। ফলে জাপান নানাভাবে চীনের দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইভাবে চীনা ভাষার সাহিত্য জাপানী ভাষায় সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। জাপানের চীনা অধিবাসীরা জাপানে অনেক বৌদ্ধমন্দির তৈরী করে। চীনের অনেক শিল্প বিশেষ করে তাঁত শিল্প জাপানে চালু হয়। চীনের প্রভাবে জাপানে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটে।

আনাম : আনাম আর একটি পড়শী রাজ্য যার উপর চীনের প্রভাব দেখা যায়। অনেক চীনদেশীয় লোক সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে চীনের সভ্যতা সে দেশে বহন করে নিয়ে যায়।

সংক্ষেপে, এই সময় চীনের সভ্যতা এত উঁচু স্তরে পৌঁছায় যে পড়শী দেশগুলি সকলেই তাকে অনুকরণ করে গৌরববোধ করতে থাকে।

উত্তর করে শেখো

১। তাং যুগে চীনের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে যা জান লেখ। ব্যবসা-বাণিজ্য সভ্যতা বিকাশে কিভাবে সাহায্য করেছিল?

২। তাং যুগে চীনের নিম্নলিখিত দেশের সঙ্গে যোগাযোগ সম্বন্ধে যা জান লেখ—

(ক) ভারতবর্ষ, (খ) কোরিয়া, (গ) জাপান, (ঘ) আনাম।

৩। তাং শাসনকালে চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্বন্ধে যা জান লেখ।

ষড়ত্রিংশ পাঠ

তাং শাসনকালে চীন-সভ্যতা

উঁচু মানের সভ্যতা : তাং শাসনকালে চীনের সভ্যতা যে খুব উঁচু মানের ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তোমরা দেখেছ যে চীনের প্রশাসন প্রায় আধুনিককালের প্রশাসনের মতই ছিল। তোমরা পড়েছ যে চীনদেশে তখন প্রচুর বিদ্যালয় ছিল; বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় অগ্রণী ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও চীন ছিল খুব পটু।

এখন আমরা আরও পড়ব, সাহিত্য, চারুকলা ও শিল্পের ক্ষেত্রে চীনের সভ্যতা কত উন্নতি করে।

সাহিত্য : কবিতা, সাহিত্য এ সময় উন্নতির চরম শিখরে ওঠে। চীনা সাহিত্যের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা এ সময় রচিত হয়। লি পো ও টু ফু ছিলেন তাং যুগের দু'জন শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখক। এ ছাড়া কথা-সাহিত্যে, বিশেষ করে ছোট গল্প লেখায় চীনা সাহিত্য বিশেষভাবে এগিয়ে যায়।

চারুকলা : এ সময় ছবি আঁকায় চীনারা বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়। মঠ-মন্দিরের গায়ে আঁকা অনেক চমৎকার ছবি আজও বজায় রয়েছে। এ ছাড়া মূর্তি গড়ার কাজেও চীনদেশের লোকের বিশেষ দক্ষতা আমরা দেখতে পাই। খুব সুন্দর সুন্দর মঠ মন্দিরও ঐ সময় তৈরী হয়। এসব ক্ষেত্রে বিদেশী শিল্পকলার বিশেষ করে ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পকলার সঙ্গে চীনের শিল্পকলা অদ্ভুতভাবে মিশে গিয়ে শিল্প-কলার চরম উৎকর্ষতা লাভ করে। চীনা মাটির কাজে চীনদেশের লোকেরা আগে থেকেই ওস্তাদ। তাই এ সময় চীনা মাটির কাজে তারা আরও নিপুণতার পরিচয় দেয়।

বই ছাপার কাজ : বই ছাপার কৌশল যদি আবিষ্কার না হত তাহলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা যে তেমন হতে পারত না, তা তোমরা বোঝ। সম্ভবতঃ চীনদেশেই বই ছাপার কৌশল প্রথম আবিষ্কৃত হয়। চীনে পাওয়া একখানা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থই সম্ভবতঃ পৃথিবীর সব চাইতে পুরাতন ছাপা বই। প্রথমে চীনদেশের লোকেরা কাঠের ছাঁচ কেটে বই ছাপাতো। তাং সম্রাটদের শাসনকালে প্রচুর বই ছাপা হয়। তখন একা চীনদেশে যত ছাপা বই ছিল, সম্ভবতঃ পৃথিবীর সবদেশ মেলালেও তার সমান হতে পারত না।

চা-এর চাষ ও ব্যবহার ঃ তোমরা জান যে বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোকই চা-কে পানীয় হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। চা-এর চাষ ও পানীয় হিসেবে চা-এর ব্যবহারেও চীনদেশ পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী ছিল। প্রথম চীনদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে চা পান প্রচলিত ছিল। তাং সম্রাটদের শাসনকালে চীনদেশের সর্বত্রই চা পান প্রচলিত হয়। ফলে চা-শিল্প চীনদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হয়ে দাঁড়ায়।

চাষীদের জমির মালিকানা দেওয়ার চেষ্টা ঃ তোমরা জান যে, আমাদের দেশেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত যারা নিজের হাতে জমি চাষ করত তারা জমির মালিক ছিল না। টাকাওয়ালা লোকেরাই ছিল জমির মালিক। চাষীরা তাদের প্রজা হয়ে জমি চাষ করত। চীন দেশেও ঐ একই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাং সম্রাটদের শাসন-কালে এ অবস্থা পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়। তাঁরা সকলকে দেশের জমি সমানভাগে ভাগ করে দেওয়ার প্রথা প্রচলিত করতে চেষ্টা করেন। একজন লোক যাতে বেশী জমির মালিক হতে না পারে তার জন্য আইন করা হয়। চাষীরাই হবে জমির মালিক ও তারা সোজাসুজি সরকারকে কর দেবে। তোমরা সামন্ততন্ত্র প্রথার কথা পড়েছ। এ প্রথা সামন্ত-তন্ত্র প্রথার বিপরীত। তাং সম্রাটরা এই চেষ্টায় পুরোপুরি সফল হতে পারেন নি। কেননা ধনী ও শক্তিশালী লোকেরা এই নির্দেশ মেনে চলেন নি। কিন্তু তবু তাং সম্রাটদের শাসনকালে, নিজে জমির মালিক এমন কৃষকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়।

উত্তর করে লেখো

১। চাষীরা যাতে নিজের চাষের জমির মালিক হতে পারে তার জন্য তাং সম্রাটদের শাসনকালে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? এই ব্যবস্থা কতখানি সফল হয়েছিল? এই ব্যবস্থা পুরোপুরি সফল না হওয়ার কারণ কি?

২। তাং সম্রাটদের শাসনকালে নিম্নলিখিত বিষয়ের উন্নতি সম্বন্ধে যা জান লেখ—

(ক) সাহিত্য, (খ) চারুকলা, (গ) বই ছাপার কাজ, (ঘ) চায়ের চাষ ও ব্যবহার।

সপ্তত্রিংশ পাঠ

তাং সম্রাটদের পর চীনের ইতিহাস (৯০৭-১২৭৯)

পাঁচটি সম্রাট বংশের কথা : তাং বংশের পতনের পর মাত্র ৫৩ বছরের মধ্যে পর পর পাঁচটি সম্রাট বংশ রাজত্ব করেন। এই সম্রাট বংশদের মধ্যে কেউই শক্তিশালী ছিলেন না। নিজেদের সম্রাট বলে ঘোষণা করলেও, কোন বংশই চীনের বিস্তৃত এলাকা নিয়ে সাম্রাজ্য গঠন করতে পারেন নি। তাঁদের রাজ্য-সীমা প্রধানতঃ চীনের উত্তর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। এঁদের রাজত্বকালে চীনের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতিরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এদের সঙ্গে এই সম্রাট বংশদের অনেক সময়ই যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হত।

দশটি রাজ্যের কথা : একই সময় চীনের দক্ষিণদিকে দশটি রাজ্য প্রধান হয়ে ওঠে। এই দশটি রাজ্যের কেউ কেউ রাজা উপাধি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। কেউ কেউ বা সম্রাট উপাধিও নেন। মোট কথা এই ৫৩ বছর চীনের সভ্যতার কোনরূপ পতন না ঘটলেও, তা তেমন এগিয়ে যেতে পারেনি।

সুং সম্রাট বংশ : ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে সুং বংশ নামে এক নতুন সম্রাট বংশ স্থাপিত হয়। আগের আগের সম্রাট বংশগুলোর মত সুং বংশের শাসন প্রথমে চীনদেশের উত্তরাংশেই স্থাপিত হয়। কিন্তু সেখানে বিদেশী শত্রুদের চাপে পড়ে সুংরা ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকে সরে আসতে বাধ্য হয়। চীনের উত্তরদিকের দেশগুলির ওপর কর্তৃত্ব ছেড়ে না দিলেও সুং বংশের প্রাধান্য চীনদেশের দক্ষিণাংশে বিশেষভাবে বিস্তৃত থাকে। তাঁরা তাঁদের রাজধানীও দক্ষিণদিকে সরিয়ে আনেন। এর ফলে চীনের দক্ষিণাঞ্চলের বিশেষ করে সমুদ্র-পারের জায়গাগুলির বিশেষ উন্নতি ঘটে।

তিনশো বছরেরও বেশী সময় সুং বংশ চীনদেশ শাসন করে (৯৬০ খ্রীঃ থেকে ১২৭৯ খ্রীঃ পর্যন্ত)। তারপর বিদেশী শত্রুদের হাতে পরাজিত হয়ে তাঁদের সিংহাসন যায়।

সুং শাসনকালে চীনের দক্ষিণাংশের প্রাধান্য : এতদিন পর্যন্ত চীনের সভ্যতার কেন্দ্র ছিল তার উত্তরাঞ্চল। কিন্তু সুংদের রাজত্বকালে, চীনের দক্ষিণাঞ্চলে, বিশেষ করে ইয়াংসি নদীর উপত্যকা বিশেষ প্রাধান্য পায়।

চীনের সভ্যতার অগ্রগতি ঃ ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দ এই ৩৭২ বছরের চীনদেশের শাসনের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে বলা হল। এর মধ্যে পাঁচটা সম্রাট বংশ শাসন করেছে, দশটা রাজত্ব প্রাধান্য পেয়েছে ও সকলের শেষে স্থং সম্রাটরা দীর্ঘদিন ধরে চীনদেশ শাসন করেছে। এসময় সারা চীন এক সম্রাট বংশের শক্ত শাসনের অধীনে থাকলেও দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা যায়। বিদেশী শত্রু বার বার দেশ আক্রমণও করেছে। তবু চীনের সভ্যতার অগ্রগতি কিন্তু কখনও থেমে যায় নি। স্থং সম্রাটদের শাসনকালে তা দ্রুত গতিতেই অগ্রসর হয়। এটা চীন জাতির বিশেষ প্রতিভার প্রকাশ বলে মেনে নিতে হয়। সব রকম প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও তারা নিজেদের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

উত্তর করে শেখো

১। ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনদেশের শাসন সম্বন্ধে যা জান খুব সংক্ষেপে লেখ।

২। এই সময়টা সভ্যতার অগ্রগতির জন্য কেন অনুকূল ছিল না ব্যাখ্যা কর। প্রতিকূল অবস্থা সত্বেও চীনের সভ্যতার অগ্রগতির প্রধান কারণ কি ছিল ?

অষ্টত্রিংশ পাঠ

স্থং শাসনকালে চীন সভ্যতার উন্নতি

সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ঃ স্থং সম্রাটদের শাসনকালে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার বেশী করে ঘটে। চীনের লোকেরা খুব ভাল সমুদ্র জাহাজ তৈরী করত। আবার কম্পাস ব্যবহার করে তারা মাঝ-সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করত। ফলে দূর সমুদ্রে পাড়ি জমাতে তাদের একটুও অসুবিধা হত না। চীনের দক্ষিণ উপকূলের অনেক জায়গাই আমদানি-রপ্তানির জন্য প্রধান বন্দরে পরিণত হয়েছিল।

সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ঃ দেশের সম্পদ বাড়ে বলে বর্তমানকালে প্রায় সব দেশের সরকারই ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াতে

চেষ্টা করে থাকে। আমদানি-রপ্তানি করা জিনিসের উপর কর বসিয়েও সরকারের অনেক লাভ হয়। চীনদেশে আজ থেকে সাতশ' বছর আগে বর্তমানকালেরই মত ব্যবসা-বাণিজ্যকে ব্যবসায়ীদের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে না দিয়ে সরকার নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে। সুং সম্রাটেরা বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য বিদেশে রাজদূত পাঠান। দেশের রপ্তানির চেয়ে আমদানি যাতে বেড়ে না যায় তার জন্য সরকার আইন করে বিলাস-দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ করে দেন। এছাড়া দেশের ভেতরের ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপরও সরকার কর্তৃত্ব করতে চেষ্টা করেন। যেখানে যে জিনিষ উদ্বৃত্ত হত সরকার তা কিনে নিতেন। তারপর যেখানে সে জিনিষের অভাব দেখা দিত সেখানে তা বিক্রয় করতেন। মধ্যযুগে কোথাও কোনো সরকারকে এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হতে দেখা যায়নি।

জাপান, ভিয়েতনাম, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য : জাপানের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য খুবই বৃদ্ধি পায়। বর্তমান ভিয়েত-নামের চম্পা রাজ্য থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য সুং রাজসভায় রাজদূত পাঠান হয়। জাভা, সুমাত্রা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য ভালভাবে চলে।

নৌবাহিনী গঠন : বিশেষ করে জলপথের বাণিজ্যকে রক্ষা করার জন্য চীনদেশ ঐ সময় একটি নৌবাহিনী গঠন করে।

চাষাবাসের উন্নতি : চাষাবাসের উন্নতির দিকেও সরকারের দৃষ্টি ছিল প্রখর। সরকারের চেষ্টায় চম্পা রাজ্য থেকে বেশী ফলনশীল ধান এনে চীনে চাষ করার ব্যবস্থা করা হয়। যে জমিতে যে ধরনের ফসল ভাল ফলে সে জমিতে সেই ধরনের ফসল লাগানোর জন্য সরকার থেকে উৎসাহ দেওয়া হত। ফসল লাগানোর সময় রাজকোষ থেকে চাষীদের টাকা-পয়সা সাহায্য দেওয়া হত। চাষীরা চাষ করে সে টাকা পরে শোধ করে দিত।

বিষয়-সম্পত্তির ওপর কর : ব্যবসা-বাণিজ্য চাষবাস প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই যখন সরকার দায়িত্ব নিতে আরম্ভ করেন তখন সরকারের টাকা-পয়সার প্রয়োজন বেড়ে যায়। তাই নানাভাবে কর বসিয়ে সরকারকে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করতে হয়। সুং সম্রাটরা একটি বিশেষ কর বসান তা হল সম্পত্তি কর। স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ হিসেবে এ কর দিতে হত। তোমরা হয়ত জান, আধুনিককালে অনেক সরকারই

এই কর আদায় করে থাকেন। আমাদের দেশেও এরকম কর বসান হয়েছে।

নতুন নতুন শহরের সৃষ্টি : ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তারের ফলে অনেক নতুন নতুন শহরের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে বন্দরগুলি শহরে পরিণত হয়। তাদের টাকা-পয়সা, লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলে। এতে শহরবাসী এক নতুন ধনীসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি : এই সময় শিক্ষার মান আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়। চিকিৎসা শাস্ত্র, উদ্ভিদবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের চর্চা চীনের লোকেরা বিশেষভাবে করতে থাকে। দর্শন শাস্ত্রেও চীনের লোকেরা নতুন নতুন চিন্তার ও ভাবধারার সৃষ্টি করেন।

ছাপাখানার উন্নতি : বই ছাপার কৌশলেরও অনেক উন্নতি হয়। ছাপা বই-এর সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়।

সাহিত্যক্ষেত্রে উন্নতি : কবিতা লেখা, রচনা লেখা ও ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে চীনদেশের লোকেরা এই সময় বিশেষ উন্নতি করে।

উত্তর করে শেখো

১। সুং শাসনকালের কোন্ কোন্ কাজ আধুনিককালের কাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা আলোচনা কর।

২। সুং শাসনকালে চীনের সভ্যতার সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্বন্ধে একটি রচনা লেখ।

ঊনচত্বারিংশ পাঠ

বিদেশীদের অধীনে চীনদেশ

মঙ্গোল জাতি : চীনদেশের উত্তরে অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি মঙ্গোলরা অনেক দিন থেকেই বাস করত। তারা ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। অনেক সময়ই মঙ্গোলরা চীন আক্রমণ করে লুঠপাট করতে আসত। চীনের সম্রাটরা তাদের প্রতিহত করেন। চীনের বিখ্যাত দেওয়াল প্রধানতঃ মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য তৈরী

করা হয়। অনেক সময় চীনের সম্রাটরা মঙ্গোলদের জয় করে তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

মঙ্গোল জাতির ইসলামধর্ম গ্রহণ : ইসলামধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের মৃত্যুর পর সারা মধ্য-এশিয়া যখন ইসলামধর্মের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল মঙ্গোলরাও তখন ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। ইসলাম-ধর্মের প্রেরণায় তারা নতুন নতুন দেশ জয় করে নিজেদের ধর্মপ্রচার করতে বেরিয়ে পড়ে।

মঙ্গোল জাতির চীন বিজয় : মঙ্গোলরা মধ্য-এশিয়ার প্রায় সবটুকু এবং পূর্ব-ইউরোপের অনেক জায়গা জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। তারপর তারা দক্ষিণ দিকে চীনে প্রবেশ করে। শেষ সুং সম্রাটকে পরাজিত করে, তারা চীনদেশ নিজেদের সাম্রাজ্য-ভুক্ত করে। সে আজ থেকে প্রায় সাতশ' বছর আগের কথা (১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)।

চীনদেশে মঙ্গোল শাসন ও প্রকৃত মধ্যযুগের সূচনা : প্রায় একশো বছর (১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) চীন মঙ্গোলদের শাসনে থাকে।

এ সময় থেকেই আমরা চীনদেশে প্রকৃত মধ্যযুগের সূচনা ধরতে পারি। এখানে মধ্যযুগ বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝব এমন সময় যখন সভ্যতা এগিয়ে যাওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গোলরা চীনের সভ্যতাকে ধ্বংস না করলেও তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। মঙ্গোলরা চীন থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর দেশীয় সম্রাটরাই আবার দেশ শাসন করতে থাকেন। কিন্তু তাঁরা গতানুগতিক পথে চলার ফলে চীনের সভ্যতা অনেক দিন আর না এগিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

মঙ্গোল শাসনকালে বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও চীনাদের বিদেশে বসতি বিস্তার : এশিয়া ও ইউরোপ এই দুই মহাদেশ জুড়ে ছিল মঙ্গোলদের সাম্রাজ্য। চীন এই সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ায় বিশেষ করে এশিয়ার নানা দেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ বেড়ে যায়। জাভা, ভারতবর্ষ, সিংহল প্রভৃতি জায়গায় চীনের ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে যেতে আরম্ভ করে। পশ্চিম-এশিয়ায় নদীর বাঁধ প্রভৃতি কাজে চীনদেশীয় ইঞ্জিনিয়ারদের কাজে লাগান হয়ে থাকে। বিদেশের অনেক জায়গায় গিয়ে চীনের লোকেরা "কলোনি" স্থাপন করে বসবাস করতে থাকে। মস্কো, নভোগর্ড প্রভৃতি জায়গায় চীনা "কলোনি" স্থাপিত হয়।

চীনে বিদেশী ধর্ম : নিজেরা মুসলমান হলেও মঙ্গোলরা কিন্তু অন্যধর্মের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করত না। তাই বিশাল সাম্রাজ্যের নানা জায়গা থেকে সব লোকেরাই চীনদেশে আসত। অনেক খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক চীনে আসার ফলে চীনের কিছু কিছু লোক খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। আবার মুসলমান ধর্মের প্রসার চীনে আরও বেশী হয়েছিল। আরব মুসলমানরা অনেকে ব্যবসা করতে এসে চীনে থেকে যায়। শাসনকর্তারাও অনেকেই মুসলমান ছিলেন। আবার মঙ্গোল সৈন্যদের মধ্যেও অনেকে মুসলমান ছিল।

তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব : অনেকদিন থেকেই চীনের বেশীর ভাগ লোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিব্বত চীনের পড়শী রাজ্য। তিব্বতের সঙ্গে চীনের অনেকদিন থেকে যুদ্ধ বিবাদ চলছিল। আবার দুই দেশ দুই দেশকে নানাভাবে প্রভাবান্বিতও করে। তিব্বতের লোকেরাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। কিন্তু তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্ম দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত ছিল। মঙ্গোলদের শাসনকালে চীনে তিব্বতীয় বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার ঘটে।

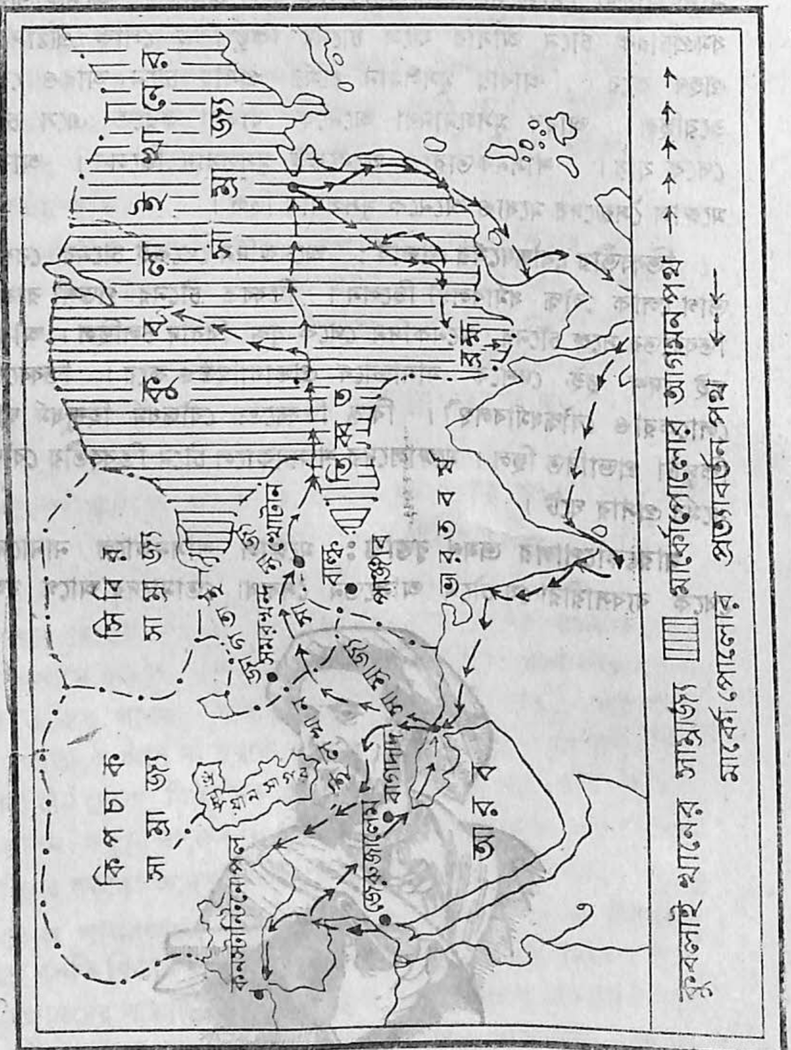
মারকোপোলর ভ্রমণ বৃত্তান্ত : মঙ্গোল শাসনকালে নানাদেশ থেকে ব্যবসায়ীরা যে চীনে আসতেন সেকথা তোমাদের আগে বলা



মারকোপোলো

হয়েছে। মারকোপোলো ছিলেন ইটালির ভেনিস শহরের লোক। তিনি তাঁর বাবা ও কাকার সঙ্গে নানা দেশ ঘুরে নানা বিপদের মধ্য

দিয়ে চীনদেশে এসে পোঁছোন। মারকোপোলোর বয়স তখন মাত্র ২১ বছর। মঙ্গোল সম্রাট তাঁকে রাজকর্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন। রাজকর্মচারীরূপে তিনি চীনের নানা জায়গা ভ্রমণ করেন। ১০



বছরেরও বেশী সময় মারকোপোলো চীনে থাকেন। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেশের পথে রওয়ানা হন। যাওয়ার পথেও তিনি অনেক দেশ ঘুরে তবে নিজের দেশে পৌঁছান। ওপরের ম্যাপে তাঁর আসার ও যাওয়ার পথ দুই-ই দেওয়া আছে। ভাল করে তা

দেখে নাও। তিনি এক ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে গেছেন। এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইউরোপের লোকের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এত দেশের বর্ণনা ছিল যে, তা পড়ে ইউরোপের লোকের ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞান বেড়ে যায়। অনেক দুঃসাহসিক পর্যটককে এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত অনুপ্রেরণাও যোগায়। কলম্বাস, যিনি আমেরিকা আবিষ্কার করেন, মারকোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে তিনিও অনুপ্রাণিত বোধ করেন।

কুবলাই খাঁর দরবার এবং পিকিং শহর মারকোপোলো নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেন। শহরের বাজারে দেশ বিদেশের পণ্য আসত। বিদেশীদের জন্য ভাল ভাল হোটেল ছিল। দেশ ভরে আঙ্গুর গাছের ঝাড়, ক্ষেত ও বাগান, স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মঠও দেখা যেত। কুবলাই খান বুদ্ধিমান তরুণ মারকোপোলোকে এক নগরের শাসনভার অর্পণ করেছিলেন। সেই শহর হ্যাং চাউ-এ ছিল বাঁধানো রাস্তা ও নর্দমা, বহু পুল, বাজার, বন্দর ও দোকান।

কুবলাই খান : কুবলাই খানের কথা না বললে, চীনদেশে



কুবলাই খান

মঙ্গোলদের শাসনের কথা শেষ করা যায় না। কুবলাই খানই, সুংদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মোঙ্গলদের চীন বিজয় সম্পূর্ণ করেন।

কুবলাই খানের সাম্রাজ্য এশিয়া ও ইউরোপ এই দুই মহাদেশেই বিস্তৃত। অবশ্য এতবড় সাম্রাজ্যের সব জায়গায় তাঁর পক্ষে সোজাসুজি শাসন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর আধিপত্য মোটামুটিভাবে মেনে চলতেন, এমন লোকেরাই দূর দূর জায়গায় শাসন কার্য চালাতেন।

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক জায়গা তিনি জয় করেন ও অনেক জায়গার

সঙ্গে রাজদূত পাঠিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সিংহল, দক্ষিণ ভারত, মাদাগাস্কার প্রভৃতি জায়গায় কুবলাই খান রাজদূত পাঠান।

চীনে তাঁর রাজসভা খুব জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। তিনি গুণীর আদর করতে জানতেন। নানা দেশের লোক তাঁর রাজসভায় আসতেন। মারকোপোলো কুবলাই খানের রাজসভায় আসেন।

কুবলাই খানের আর একটি গুণ ছিল যে, তিনি সকল ধর্মের লোককেই আদর করতেন। খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধধর্মের লোককেও তিনি সমাদর করতেন।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে মধ্যযুগে কুবলাই খানের মত সম্রাট খুব কমই ছিলেন।

উত্তর করে শেখো

১। মঙ্গোল জাতি সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

২। মঙ্গোল বিজয়ের সময়কে আমরা চীনদেশের "প্রকৃত মধ্যযুগ" কেন বলতে পারি?

৩। নীচের বিষয়গুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ—

(ক) মোঙ্গল শাসনকালে চীনের বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ও বিদেশে বসতি বিস্তার।

(খ) চীনে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব।

(গ) মারকোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(ঘ) ম্যাপ এঁকে মারকোপোলোর চীনে আসার ও ফিরে যাওয়ার পথ দেখাও।

(ঙ) কুবলাই খান।

চত্বারিংশ পাঠ

মধ্যযুগে জাপান

অবস্থান ঃ চীনের পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের অনেকগুলি দ্বীপ নিয়ে জাপান দেশ গঠিত। শুনে আশ্চর্য হবে যে প্রায় তিন হাজার দ্বীপ জাপানের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে ছয়শোটির বেশীতে লোক নেই। বেশীর ভাগ দ্বীপই খুব ছোট। প্রধান দ্বীপ মাত্র ছয়টি। এই ছয়টি দ্বীপ নিয়ে জাপানের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। একদিকে জাপান

দেশটি ছোট, তার ওপর ভূমিকম্প তো সব সময় লেগেই আছে। তবু আধুনিক যুগে জাপান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি। কল-কারখানা, প্রযুক্তিবিদ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে সে আজও আমেরিকার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চলেছে।

জাপানে মধ্যযুগে : চীনের ইতিহাস আমরা সপ্তম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত (মোটামুটিভাবে সাতশো বছর) পড়েছি। একই সময়ের জাপানের ইতিহাস আমরা পড়ব। এই সময়টাকে চীনের ঠিক মধ্যযুগ বলা যায় না, তা আমরা দেখেছি। কারণ ঐ সময় চীনের সভ্যতার কোন অবনতি হয়নি, বরং উন্নতিই ঘটেছে। জাপানের বেলাও এ কথা সত্য। এ সময়টা জাপানের সভ্যতার পতনের সময় না বলে বরং উন্নতির সময় বলা যেতে পারে। চীনের প্রাচীন সভ্যতা খুব গৌরবময়। প্রাচীনকালে জাপান কিন্তু সভ্যতায় তেমন কিছু উন্নতি করতে পারেনি। তার সভ্যতা ধীরে ধীরে উন্নত হয়ে আধুনিক যুগে চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। কাজেই এই সময়কার ইতিহাসকে ইউরোপ বা ভারতবর্ষের বেলা যে অর্থে মধ্যযুগ বলি (অর্থাৎ প্রাচীন সভ্যতার অবনতি), জাপানের ইতিহাসের বেলায় ঠিক সে অর্থে এই সময়কে মধ্যযুগ বলা চলে না।

জাপানের সভ্যতার ওপর বিদেশের প্রভাব : জাপানের সভ্যতার কথা পড়তে গেলে, আর একটা কথা আমাদের বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। জাপান প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বিদেশী সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত। প্রথমে সে দীর্ঘদিন পড়শী রাজ্য চীনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আধুনিককালেও সে পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত রয়েছে।

জাপানে "ফিউডল" বা জমিদারী প্রথা : ইউরোপ ও চীনের মত জাপানেও মধ্যযুগে ফিউডল বা জমিদারী প্রথা প্রবর্তিত হয়। জমিদাররা সম্রাটের কাছ থেকে জমি পান। রাজসভায় বিশেষ প্রভাব থাকলে বা সম্রাটের কোন বিশেষ কাজ উদ্ধার করে দিতে পারলে সম্রাট তাঁদের জমি দান করতেন। সিন্টো মন্দির ও বৌদ্ধ মঠও অনেক জমির মালিক হয়ে পড়ে। তাদেরও জমিদার বলা চলে। জমিদাররা আবার প্রজাদের মধ্যে চাষবাসের জন্য জমি বিলি করতেন।

জমিদারের ক্ষমতা : জমিদাররা অনেকটা স্বাধীন রাজার মতই— অধিকাংশ জমিদার রাজাকে কোন কর দিতেন না। কিন্তু তাঁরা

নিজেদের ইচ্ছামত প্রজাদের ওপর কর বসাতেন। প্রজাদের বিচারের ভারও তাঁদের ওপর ছিল। সম্রাট বা তাঁর কর্মচারীদের তাঁরা বিশেষ তোয়াক্কা করতেন না।

সম্রাটের ক্ষমতা কমে যাওয়ায় দেশে অরাজকতা : সম্রাট জমিদারদের তাঁর অনুগত রাখতে চেষ্টা করতেন। অনেকবারই সম্রাটরা জমিদারদের জমির ওপর কর বসাতে চেষ্টা করেন ; কিন্তু তাতে তাঁরা সফল হননি। জমিদাররা নামে মাত্র সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করতেন। তাঁরা নিজেদের সৈন্য রাখতেন। তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ও মারামারি লেগেই থাকত।

ফলে দেশে অরাজকতা চলে। যার শক্তি আছে সে অপরের ওপর যেমন খুশী অত্যাচার করে। ডাকাতি প্রায়ই হয়।

সৈনিক জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি : যে সমাজেগায়ের জোরের প্রাধান্য, সেখানে সৈনিক শ্রেণীর প্রভাব বাড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি! অরাজকতার সুযোগ নিয়ে জাপানে শক্তিশালী সৈনিক পরিবারের সৃষ্টি হয়। এই পরিবারগুলি সৈনিক বৃত্তিধারী লোকদের বংশানুক্রমে নিজেদের অনুগত রাখতে সক্ষম হন। এসব সৈনিক পরিবারের অনেকেরই জন্ম রাজবংশে হয়। তাঁরা অনেক জমির মালিকও হন। ফলে জাপানে সৈনিক জমিদার বলে এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। জাপানের সমাজজীবনে আজও এদের প্রভাব রয়েছে।

জাপানের সম্রাট: জাপানের সম্রাটকে মিকাডো বলা হয়। জাপানের লোকেরা বিশ্বাস করে যে মিকাডো দেবতাদের বংশধর। জাপানের সম্রাট বংশ কবে যে রাজত্ব আরম্ভ করেন, তা কেউ বলতে পারে না। প্রাচীনতম কাল থেকে আজ পর্যন্ত একই রাজবংশ জাপানে রাজত্ব করে আসছেন। সম্রাট শুধু রাজ্য শাসনই করেন না সিণ্টো ধর্মেরও তিনি প্রধান।

জাপানের অধিবাসী : জাপানের অধিবাসীরা নিজেদের দেব বংশধর বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস জাপান স্বর্গের সব চাইতে নিকটতম দেশ। এই বিশ্বাস থেকেই জাপানীদের মনে আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেমের প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে।

ফুজিওয়ারা বংশ : মিকাডোদের বংশধর হলে কি হয়, অনেকদিন ধরে রাজ্য শাসনের ক্ষমতা মিকাডোর হাতে নেই। তিনি নামে মাত্রই সম্রাট। সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ থেকে ফুজিওয়ারা বংশের হাতে রাজ্য শাসন

ক্ষমতা চলে যায়। সম্রাট বংশের পরই ফুজিওয়ারা বংশ জাপানে পবিত্র বংশ বলে খ্যাত। এই বংশের লোকেরা রাজসভায় সর্বেসর্বা। প্রাদেশিক শাসনকর্তা প্রভৃতি যত বড় বড় রাজকর্মচারীর পদ তাও ফুজিওয়ারা বংশের লোকের হাতেই থাকে।

সিণ্টো ধর্ম ঃ সিণ্টো ধর্ম জাপানের পুরানো ধর্ম। মিকাডোরা এই ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষক। সিণ্টো ধর্ম অনুসারে জাপানীরা অনেক দেব-দেবীর পূজো করতেন। তাঁরা বড় বড় মন্দির তৈরী করে খুব জাঁক-জমকের সঙ্গে পূজো করতেন। দেবতাদের মধ্যে সূর্য দেব হলেন সকলের প্রধান। জাপানীরা নিজেদের, তাঁরই বংশধর বলে বিশ্বাস করে। সিণ্টো ধর্মে মৃত পূর্বপুরুষদেরও দেবতারূপে পূজো করা হয়।

উত্তর করে শেখো

১। কারা সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাস করে দিয়েছিল? তার ফলাফল কি হয়েছিল?

২। জাপানে "ফিউডল" প্রথা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। জাপানের মধ্যযুগকে আমরা ঠিক্ ঠিক্ অর্থে মধ্যযুগ বলতে পারি না কেন ব্যাখ্যা কর।

৪। জাপানের অবস্থান ও আয়তন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। জাপানের সভ্যতার ওপর বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৬। নীচের বিষয় সম্বন্ধে যা জান লেখ—

(ক) সৈনিক জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি, (খ) মিকাডো, (গ) ফুজিওয়ারা বংশ, (ঘ) সিণ্টো ধর্ম।

একচত্বারিংশ পাঠ

প্রভাবিত জাপান

জাপানের ওপর চীনের প্রভাব ঃ পড়শী রাজ্য চীন প্রথম থেকেই সভ্যতায় জাপানের চেয়ে উন্নত। দর্শন চিন্তায় অগ্রণী এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্ম—বৌদ্ধধর্ম সে গ্রহণ করে। বৌদ্ধধর্মের ভেতর দিয়েই জাপানের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আরম্ভ হয়। জাপানের জমিদারদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁদের অনুকরণে জনসাধারণের মধ্যেও এ ধর্মের প্রসার ঘটে।

জাপানের ওপর চীনের ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব : জাপানীরা যখন বুঝে নেয় যে, কোন সভ্যতা তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তখন তারা তাকে অনুকরণ করতে থাকে। তারা ঐ সভ্যতা থেকে কোন রকমেই পেছিয়ে থাকতে রাজী নয়। তাই চীনের সভ্যতারও অনেক কিছু জাপান অনুকরণ করে।

প্রথমেই তারা চীনা লেখা ও সাহিত্যের অনুকরণ আরম্ভ করে। এ দুই-ই জাপানী ভাষার ওপর খুব প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজী ভাষার উপর যেমন ল্যাটিন ভাষার প্রভাব দেখা যায়, জাপানের ভাষার ওপরও তেমনি চীনা ভাষার প্রভাব রয়েছে।

চারুকলায় চীনের অনুকরণ : চীনের অনুকরণে গৌতম বুদ্ধের নানারকম ছবি ও মূর্তি জাপান তৈরী করতে আরম্ভ করে। বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ তৈরী করায়ও জাপান চীন তথা এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য জায়গার অনুকরণ করতে আরম্ভ করে। সম্রাট ও জমিদারদের জন্যও নতুন ধরনের বাড়ী তৈরী হতে আরম্ভ হয়।

অন্যান্য ক্ষেত্রে চীনের প্রভাব : চীনের অনুকরণে জাপানে নানা রকমের কুটির শিল্পের সৃষ্টি হয়। তার মধ্যে চীনা মাটির বাসন তৈরী করার শিল্পের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

চীনের কাছ থেকে জাপান চিকিৎসা বিদ্যাও শিখতে আরম্ভ করে। যুদ্ধবিদ্যায়ও জাপান চীনের অনুকরণ করে। এমনকি চীনের পোষাক-পরিচ্ছদও জাপানে প্রচলিত হয়।

চীনা ও কোরিয়ানদের জাপানে বসতি স্থাপন : এই সময় চীন ও কোরিয়ার অনেক লোক জাপানে বসতি স্থাপন করে। কেউ-বা বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য, কেউ-বা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, আবার কেউ বা কুটির শিল্পের কর্মীরূপে এসে জাপানে থাকেন।

চীনের প্রভাবে জাপানের শাসনব্যবস্থার সংস্কার : চীনের অনুকরণে জাপানে শাসন সংস্কারেরও চেষ্টা হয়। সম্রাট আইন কানুন প্রবর্তন করেন। নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। সৈন্যবাহিনী ও অসামরিক রাজকর্মচারীদের একেবারে পৃথক করে দেওয়া হয়। কিন্তু সম্রাটের শক্তি বৃদ্ধির কোন চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি।

ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার ও ধনী ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি : জাপানে এই সময় রূপো ও তামার খনি পাওয়া যায়। চীনের অনুকরণে জাপানে টাকারও প্রচলন হয়। ফলে জাপান ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে

যেতে থাকে। চাষবাসেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটায়। কিন্তু এসবের ফলেও দরিদ্রদের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেনি। শুধু ধনী আরও ধনী হয়ে ওঠে—ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে তফাৎ আরও বেড়ে যায়।

বিদেশীদের কাছ থেকে নিয়ে জাপানের সেটাকে নিজের করে নেওয়া : আগেই বলা হয়েছে জাপানীরা সব সময়ই বিদেশীদের কাছ থেকে অনুকরণ করেছে। কিন্তু যা সে নিয়েছে তা সে নিজের করে নিয়েছে। নিজের প্রয়োজনে তাকে নিজের মত করে বদলে নিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, জাপান চীনের কাছ থেকে বৌদ্ধধর্ম নিয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে বৌদ্ধধর্মকে নিজের মত করে পরিবর্তন করে নিয়েছে। আবার চীনের অক্ষর কিছুটা গ্রহণ করলেও জাপান তার নিজস্ব অক্ষরমালারও সৃষ্টি করেছে।

সেনাপতি য়োরিটোমো (Yoritomo) : জাপানে সৈনিক সম্প্রদায় যে প্রধান হয়ে ওঠে একথা তোমাদের আগেই বলা হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় আটশো বছর আগে য়োরিটোমো নামে একজন সেনাপতি জাপানে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। তিনি সম্রাটের অসামরিক কর্মচারীর পাশে, তাঁর সামরিক কর্মচারী নিযুক্ত করেন। যেমন, সম্রাটের কর আদায়কারী অসামরিক কর্মচারী আছে তার সাথে য়োরিটোমো কর আদায়ের জন্য নিজের সামরিক কর্মচারী নিযুক্ত করেন। এই সামরিক কর্মচারীরা অসামরিক কর্মচারীদের চেয়ে বেশী দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন। এভাবে সম্রাট ও তার অসামরিক কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও সমস্ত শাসনক্ষমতা য়োরিটোমোর হাতে চলে যায়। সারা দেশব্যাপী এই যে সামরিক কর্মচারী দ্বারা শাসনব্যবস্থা, একে 'বকুফু' (Bakufu) বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে জাপানে তখন দুটি শাসনব্যবস্থা চলতে থাকে।

সোগুন পদের সৃষ্টি : য়োরিটোমো সোগুন (Shagun) উপাধি গ্রহণ করেন। সোগুন শব্দের সাধারণ অর্থ সেনাপতি। কিন্তু য়োরিটোমো এই উপাধি নেওয়ার পর থেকে, তার অর্থ হয়ে দাঁড়ায় "সামরিক একনায়ক"। তিনি নতুন রাজধানী তৈরী করে সেখান থেকে দেশ শাসন করতে লাগলেন। এইভাবে জাপানে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হল। সম্রাট ও য়োরিটোমো ভিন্ন ভিন্ন রাজধানী থেকে দেশ শাসন করতে লাগলেন।

পরবর্তী সোগুনগণ : য়োরিটোমোর পর তাঁর বংশের লোকেরাই

সোগুন হতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু এই বংশের হাতে বেশী দিন প্রকৃত ক্ষমতা থাকল না। সোগুন পদের বিলোপ সাধন না ঘটলেও হোজো নামে আর এক সেনাপতি বংশ প্রকৃত ক্ষমতার মালিক হয়ে বসলেন। কিছুদিন পরে য়োরিটোমোর বংশ লোপ পেল। তখন থেকে ফুজিওয়ারা বা সম্রাট বংশের কেউ সোগুন নিযুক্ত হলেন। সোগুন উপাধি আর পরিবারগত থাকল না।

হোজো বংশ : ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১১৪ বছর জাপানে প্রকৃত ক্ষমতা হোজো বংশের হাতে থাকে। হোজো বংশের প্রাধান্যের কালেই কুবলাই খান জাপান জয় করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

হোজো বংশের ক্ষমতা কমে আসতে থাকলে দীর্ঘদিন গৃহযুদ্ধ চলার পর সম্রাট তাঁর ক্ষমতা আবার অনেকখানি উদ্ধার করতে সক্ষম হন।


সামুরাই

জাপানে কনফিউসিয়াসের নীতি অনুকরণ : চীনের সভ্যতার অনেক কিছুই জাপান অনুকরণ করে, তা তোমরা পড়েছ। চীনের সভ্যতার মধ্যে একটা বড় জিনিস কনফিউসিয়াসের দর্শন ও নীতি। জাপানের সৈনিক সম্প্রদায়ের ওপর কনফিউসিয়াসের নীতির প্রভাব খুবই পড়ে। এর ফলে ইউরোপের নাইটদের মত, জাপানে 'বুসিডো' নামে এক বীর দলের সৃষ্টি হয়।

বুসিডো : জাপানে জমিদাররা এবং বড় বড় সেনাপতিরা নিজেদের সৈন্যবাহিনী রাখতেন। জাপানে সৈন্যদের "সামুরাই" বলা হয়। সৈনিক বলে তাদের মনে সব সময়ই নিজেদের সম্বন্ধে খুব গৌরব বোধ থাকে। তারা সব সময়ই মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং নিজের প্রভুর আদেশ পালনে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিতবোধ করে

না। এসব আদর্শের সঙ্গে কনফিউসাসের আদর্শে মিশে এক নতুন যুদ্ধ সম্প্রদায় জন্ম নিল—তাদের নাম হল বুসিডো।

বুসিডোদের আদর্শ ঃ আনুগত্য ছিল বুসিডোদের সব চেয়ে বড় আদর্শ। প্রভুর সেবায় তারা নিজেদের জীবন পরিবার প্রভৃতি কোন কিছু ছাড়তেই পেছু পা হত না। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হলে, জাপানের সম্রাট বুসিডোদের পূর্ণ আনুগত্য লাভ করেন।

আপন পরিবার ও পূর্বপুরুষদের প্রতিও বুসিডোদের প্রবল নিষ্ঠা দেখা যায়। পিতা মাতার সেবা ভাইবোনদের প্রতি ভালবাসা বুসিডোদের চরিত্রের বড় গুণ।

অর্থের প্রতি বুসিডোদের বিন্দুমাত্র লোভ নাই। তারা সাধারণভাবে জীবন কাটাতে ভালবাসে। প্রচণ্ড ব্যথা ও কষ্টের মধ্যেও আত্মসংযম রক্ষা করার শিক্ষা তাদের থাকে।

হারাকিরি ঃ বুসিডোদের আত্মসম্মান জ্ঞান খুব প্রবল। যেখানে আত্মসম্মান রক্ষা করা যাচ্ছে না, সেখানে তাঁরা আত্মাহুতি দেওয়া বা হারাকিরি করা অনেক ভাল বলে মনে করে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আত্মহত্যা বা হারাকিরি করাকে বুসিডোরা নিজেদের অধিকার বলে মনে করে। হারাকিরির প্রভাব জাপানে আজও খুব বেশী। প্রতি বছর অনেক লোক আজও জাপানে হারাকিরি করে ও তাকে খুব গৌরবের কথা বলে মনে করে।

উত্তর করে শেখো

১। মধ্যযুগে জাপানের ওপর চীনের প্রভাব সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ।

২। সোগুন পদের সৃষ্টি কি করে হয়েছিল ?

৩। সম্রাটের ও সোগুনের শাসন কিভাবে একসঙ্গে জাপানে চলতে থাকে বুঝিয়ে লেখ।

৪। বুসিডো ও তাদের আদর্শ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। হারাকিরি কাকে বলে ? জাপানে তার প্রভাব কেমন ?

দ্বাচত্বারিংশ পাঠ

ভারতবর্ষে হূণ আক্রমণ

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সুরু : গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন থেকেই ভারতবর্ষে মধ্যযুগের সুরু বলে ধরা যেতে পারে। কারণ গুপ্তদের পর থেকেই গৌরবমণ্ডিত হিন্দু সভ্যতার পতন আরম্ভ হয়। এরপর থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিশেষভাবে বিদেশীদের রাজত্বের ভেতর দিয়ে ভারত বর্তমান যুগে প্রবেশ করে। তাই এ সমটাকে ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগ বলা যেতে পারে।

হূন জাতি : হূণ আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। এই হূণেরাই যে রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল, তা তোমরা পড়েছ। হূণেরা এক বর্বর জাতি। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় তারা ছিল দুর্ধর্ষ। মধ্য এশিয়া ছেড়ে তাদের একদল ইউরোপে যায়; আর অন্য দল উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতের দিকে অগ্রসর হয়।

পারস্য ও কাবুল বিজয় : প্রথমে হূণেরা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত দুটি রাজ্য, পারস্য ও কাবুল জয় করে। তারপর তারা উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাদের ভারতবর্ষ অভিযান আরম্ভ হয়।

স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে যুদ্ধ : গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষ পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন স্কন্দগুপ্ত। যুদ্ধ করে তিনি হূণদের হারিয়ে দেন। ফলে হূণেরা আর ভারতবর্ষের ভেতর ঢুকতে পারেনি। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারতে কয়েকটি ছোট রাজ্য গড়ে তারা রাজত্ব করতে থাকে।

হূণ রাজা তোরামান ও মিহিরকুল : ভারতে হূণ রাজাদের মধ্যে তোরামান ও মিহিরকুলই ছিলেন সব চেয়ে পরাক্রমশালী। তাঁদের রাজত্বকালে পশ্চিম ভারত থেকে মধ্য ভারতেও হূণ রাজ্য বিস্তার লাভ করে। মিহিরকুল খুব অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর ছিলেন—তাঁর অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার কথা আমরা সমসাময়িক লেখা থেকে জানতে পারি।

যশোবর্মনের নিকট হূণদের পরাজয় : কিন্তু হূণেরা বেশীদিন তাদের প্রতাপ রক্ষা করতে পারেনি। গুপ্তদের পতনের পর যশোবর্মণ ছিলেন মালোয়ার একজন শক্তিশালী রাজা। তিনি হূণদের পরাজিত করে তাঁদের ক্ষমতা ধ্বংস করেন।

হূণদের রাজপুতদের সঙ্গে মিশে যাওয়া : এর পরেও ছোট ছোট

হূণ রাজা বা দলপতি পশ্চিম ভারতে বেশ কিছুদিন রাজত্ব করতে থাকেন। ধীরে ধীরে হূণেরা রাজপুত জাতির সঙ্গে মিশে যায়। ভারতবর্ষের এ এক বড় গৌরব। অনেক বিদেশী ভারতবর্ষে এসেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা ভারতবর্ষের লোকের সঙ্গে মিশে গেছে।

হূণদের গুরুত্ব: ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজপুত জাতি গঠনে হূণদের অবদান খুব গুরুত্বপূর্ণ। রাজপুতদের কথা তোমরা পরে পড়বে। দেখবে তারা কি রকম বীর ও স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। হূণদের বীরত্ব ও স্বাধীনতা প্রিয়তা রাজপুত জাতির মধ্যে এই দুটি গুণ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

উত্তর করে শেখো

১। গুপ্ত যুগের পতন থেকে ভারতে মধ্যযুগের সুরু ধরা হয় কেন?
২। ভারতবর্ষের ইতিহাসে হূণদের গুরুত্ব দেওয়া হয় কেন?
৩। "ভারতবর্ষে হূণ" নাম দিয়ে একটি ছোট রচনা লেখ।

ত্রয়োচত্বারিংশ পাঠ

আবার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—হর্ষবর্ধন

ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ভারতবর্ষ: গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষ আবার ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে যুদ্ধ বিবাদ সবসময় লেগেই থাকত। এসব রাজাদের মধ্যে দু' একজন শক্তিশালী হয়ে মৌর্য্য ও গুপ্তদের মত বড় সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু কেউই তেমন সফল হতে পারেননি। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকারী রাজাদের মধ্যে হর্ষবর্ধন ছিলেন একজন।

হর্ষবর্ধন: মধ্যভারতে থানেশ্বরের রাজা ছিলেন রাজ্যবর্ধন। গৌড়ের (বাঙলার) রাজা শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি প্রাণ হারান। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন (৬০৬ খ্রীঃ)। পরে হর্ষবর্ধন তাঁর রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করেন।

সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা: সিংহাসন লাভের পর ছ বছর হর্ষবর্ধন সাম্রাজ্য গঠনের জন্য বিরামহীন যুদ্ধ করে চলেন। উত্তর এবং মধ্য-

ভারত নিয়ে তিনি ছোট খাটো একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। এরপর সমগ্র ভারতবর্ষ নিয়ে সাম্রাজ্য গঠনের কল্পনা আমরা ভারতের রাজাদের মধ্যে আর দেখতে পাইনি। হর্ষবর্ধনের ছোট সাম্রাজ্য তাঁর মৃত্যুর পরও স্থায়ী হয়নি।

আদর্শ মানুষ হর্ষবর্ধন : আদর্শ মানুষকে চিরদিনই আমাদের দেশের লোক সম্মান দিয়ে আসছে। যিনি রাজা বা দেশের নেতা তাঁকে আদর্শ মানুষ হতে হবে এই আমাদের ধারণা। অশোক যে মানুষ হিসাবে কত বড় ছিলেন তা তোমরা জান। তেমনি হর্ষবর্ধনও এক আদর্শবাদ নৃপতি। প্রজাদের সেবাই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি রাস্তা-ঘাট তৈরী ও রাজপথের পাশে জায়গায় জায়গায় সরাইখানা স্থাপন করে দেন। তিনি ছিলেন বড় দানবীর। প্রয়াগে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে তিনি পাঁচ বছর

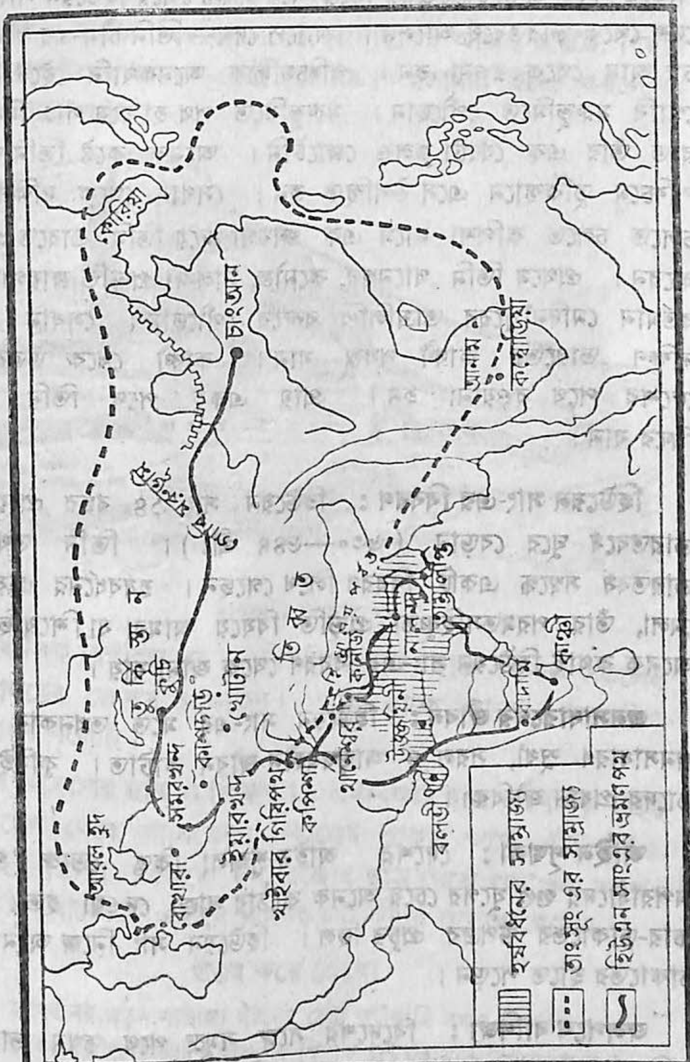


হর্ষবর্ধন

অন্তর এক মেলা বসাতেন। সেখানে দান করতে করতে শেষ পর্যন্ত নিজের পরনের জামাকাপড় পর্যন্ত দান করে নিঃস্ব হয়ে যেতেন। হর্ষবর্ধনের শিক্ষা প্রসারের দিকে খুব নজর ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন একজন পৃষ্ঠপোষক। তিনি পরমতসহিষ্ণুও ছিলেন। নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও সকল ধর্মের লোককে তিনি সম্মান করতেন। সকল ধর্মের লোককে সমান চোখে দেখা ভারতের আর একটি আদর্শ ও গৌরবময় ভূমিকা। তোমরা জান মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত সম্রাটরা সকলেই পরধর্মের লোককে সমান চোখে দেখতেন।

হিউয়েন সাং : হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চীন দেশ থেকে একজন

পর্যটক ভারতে আসেন। তাঁর নাম হিউয়েন সাং। চীন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর বৌদ্ধ ধর্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষে চীন দেশের কিছু কিছু



লোক তীর্থ করতে আসতেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে আরও জানতে চাইতেন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। হিউয়েন সাং ছিলেন তাঁদেরই একজন।

হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ পথ : বহু দেশ ঘুরে, পায়ে হেঁটে, মরুভূমি, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির ভেতর দিয়ে অনেক কষ্ট পেয়ে হিউয়েন সাং চীন দেশ থেকে ভারতবর্ষে আসেন। ম্যাপে দেখ—তিনি চীন-এর রাজধানী চাং আন থেকে রওনা হন। পশ্চিমদিকে অনেকখানি হেঁটে তিনি গোবি মরুভূমিতে পৌছোন। মরুভূমিতে পথ হারিয়ে পাঁচ দিন চার রাত তাঁর এক ফোঁটা জলও জোটেনি। অনেক কষ্টে তিনি আরও পশ্চিমে তুর্কিস্থানে এসে উপস্থিত হন। সেখান থেকে দক্ষিণদিকে চলতে চলতে কপিশা নামে এক জায়গা দিয়ে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন। প্রথমে তিনি থানেশ্বর, কনৌজ, নালন্দা প্রভৃতি জায়গা দেখে বর্তমান মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্তি বন্দরে পৌছোন। সেখান থেকে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী পর্যন্ত যান। কাঞ্চী থেকে উত্তরদিকে দেশের পথে রওয়ানা হন। প্রায় একই পথে তিনি দেশে ফিরে যান।

হিউয়েন সাং-এর বিবরণ : হিউয়েন সাং ১৪ বছর প্রায় সারা ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়ান (৬৩০—৬৪৪ খ্রীঃ)। তিনি তখনকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখে গেছেন। হর্ষবর্ধনের প্রয়াগের মেলা, তাঁর পরমতসহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিষয়ে আমরা যা শিখেছি তার অনেক কথাই হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে জানা যায়।

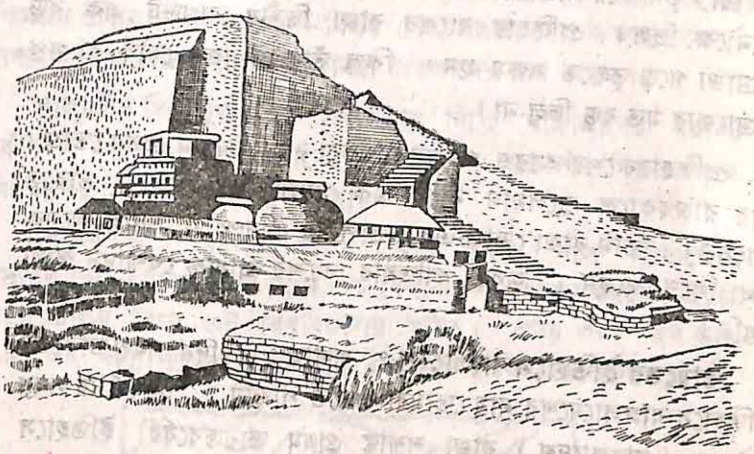
জনসাধারণের জীবন : হিউয়েন সাং-এর মতে তখনকার দিনে জনসাধারণ সুখী, সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন কাটাত। কৃষিই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা।

আইন-শৃঙ্খলা : দেশের আইন-শৃঙ্খলা কিন্তু ভেঙ্গে পড়ে। অপরাধীদের গুপ্ত যুগের চেয়ে অনেক কঠোর সাজা দেওয়া হত। তবু চোর-ডাকাতের উপদ্রব প্রচুর ছিল। হিউয়েন সাং নিজে অনেকবার ডাকাতের হাতে পড়েন।

জলপথে বাণিজ্য : বিদেশের সঙ্গে সমুদ্র পথে তখন ভারতের বাণিজ্য চলত। তাম্রলিপ্তি বন্দর থেকে দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলত—হিউয়েন সাং এ কথা লিখে গেছেন।

বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয় : প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের চর্চার জন্যই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সেখানে অন্যান্য বিষয়ের চর্চাও হত; যেমন, দর্শন, গণিত, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ হিউয়েন সাং-এর বিবরণে নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিশেষ বিবরণ আছে। তিনি কিছুদিন ঐ বিদ্যালয়ে জ্ঞান চর্চা করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আজও রয়েছে, বিহার রাজ্যের রাজগীরের কাছে—বেশী দূরে নয়। তোমরা ইচ্ছে করলে তা দেখে আসতে পার।



নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে থাকতেন। তাই তাকে আমরা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বলেছি।

দেশ বিদেশের ছাত্র ও শিক্ষকঃ এখানকার ছাত্র ও শিক্ষক দুইই দেশ বিদেশ থেকে আসতেন। কাজেই প্রকৃত অর্থে এটা "বিশ্ব-বিদ্যালয়ই" ছিল। এখানে দশ হাজার ছাত্র থেকে পড়াশুনা করত। সকল ধর্মের লোকেরাই এখানে জ্ঞানের চর্চা করার সুযোগ পেতেন।

উত্তর করে শেখো

১। হর্ষবর্ধনের নতুন সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা কতখানি সফল হয়েছিল?
২। হর্ষবর্ধনের মধ্যে আদর্শ মানুষের কি কি গুণ তোমরা দেখতে পাও?
৩। হিউয়েন সাং-এর বিবরণ থেকে আমাদের দেশ সম্বন্ধে কি কি বিষয় জানতে পারি?
৪। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বলা যেতে পারে কেন?
৫। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে যা জান লেখ?
৬। তোমার স্কুল থেকে নালন্দা যেতে হলে কিভাবে যেতে হবে?

চতুশ্চত্বারিংশ পাঠ

হর্ষবর্ধনের পরের ভারতবর্ষ

প্রতিহার বংশের সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা : হর্ষবর্ধনের পর প্রতিহার রাজারা নতুন করে সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করেন। তাঁদের রাজধানীও কনৌজে ছিল। প্রতিহার বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগভট্ট এক বড় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্য মৌর্য বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের মত বড় ছিল না।

প্রতিহারবংশের আরও একজন নামকরা রাজা ছিলেন প্রথম ভোজ। তাঁর রাজত্বকালে সুলেমান নামে এক মুসলমান ভ্রমণকারী ভারতে আসেন। তিনি রাজা ভোজ-এর প্রতাপ ও ধর্মসম্পত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখে গেছেন। অবশ্য প্রতিহার বংশের প্রাধান্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি।

ভারতের ইতিহাসে বাংলাদেশ ঃ শশাঙ্ক ঃ এতদিন পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে বাঙ্গলাদেশের নাম তোমরা শুনতে পাওনি। হর্ষবর্ধনের সময় গৌড়ের (বাঙলাদেশ) রাজা শশাঙ্ক প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রাধান্য লাভ করেন। সে আজ থেকে তেরোশো বছরের আগের কথা। মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণে তাঁর রাজধানী ছিল। শশাঙ্ক বাঙ্গলাদেশের বাইরেও তাঁর রাজ্যবিস্তার করেন। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মগধ, উৎকল ও কনৌজ তাঁর অধীনে ছিল বলে জানা যায়।

বাঙ্গলার পাল বংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ঃ শশাঙ্কের পর প্রায় একশো বছর বাঙ্গলাদেশে "মাৎস্য, ন্যায়" বা অরাজকতা বলে। ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে পাল বংশের প্রথম রাজা গোপালকে, দেশের লোকেরা একত্রে মিলিত হয়ে বাঙ্গলার সিংহাসনে বসায়। প্রজারা মিলিত হয়ে নিজেরা রাজা নির্বাচন করে—এধরনের ঘটনা তখনকার দিনে ইতিহাসে বেশী ঘটতে দেখা যায়নি।

ধর্মপাল ঃ পাল রাজাদের মধ্যে ধর্মপালের নাম বিশেষ করে করতে হয়। ধর্মপাল বাঙ্গলাদেশকে উত্তর ভারতের প্রধান রাজ্যে পরিণত করেন। বিহার তাঁর অধীনে ছিল। উত্তরে দিল্লী, জলন্ধর প্রভৃতি স্থানে ধর্মপাল রাজ্য বিস্তার করেন। কনৌজের ওপরও তাঁর আধিপত্য ছিল। দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের সীমানা ছিল।

দেবপাল ঃ ধর্মপালের ছেলে দেবপালের সময় পাল সাম্রাজ্য আরও

বড় হয়। উড়িষ্যা পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আসামের রাজাও দেবপালের বশ্যতা স্বীকার করেন। দেবপালের নাম ভারতের বাহিরে সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি জায়গায়ও ছড়িয়ে পড়ে।

বাঙ্গলার সিংহাসনে সেন রাজবংশ ঃ পাল রাজাদের পর সেন রাজারা বাঙ্গলার সিংহাসনে বসেন (১০৯৫ খ্রীঃ)। এই বংশের তিনজন প্রধান রাজা ছিলেন—বিজয় সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন। লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে মুসলমানরা বাঙ্গলাদেশ জয় করেন।

বাঙ্গালীর বিদ্যানুরাগ ঃ লেখাপড়ার দিকে বাঙ্গালীদের বরাবর ঝোঁক। পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকালে বাঙ্গালীর বিদ্যার দিকে অনুরাগের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিক্রমশীলা ঃ ধর্মপাল মগধে (মগধ তখন পাল সাম্রাজ্যের ভেতরে ছিল) বিক্রমশীলা নামে এক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। ছয়টি মহাবিদ্যালয় নিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত। প্রায় ৩০০ জন ছাত্র ১৪৪ জন অধ্যাপকের তত্বাবধানে বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা



অতীশ দীপঙ্কর

করত। তিব্বত প্রভৃতি ভারতের বাইরের অনেক জায়গা থেকে বহু ছাত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসত। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০০০ লোকের একসঙ্গে বসবার ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ৪০০ বছর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ছিল।

ওদন্তপুরী ঃ পাল রাজাদের রাজত্বকালে ওদন্তপুরী নামে আর

একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠে। ওদন্তপুরীতে প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র পড়ান হত। বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অতীশ দীপঙ্কর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন।

সোমপুরী ঃ রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে সোমপুরী নামে আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

বাঙ্গালী পণ্ডিতের সমাদর ঃ এই যুগে অনেক বাঙ্গালী পণ্ডিত ভারত ও ভারতের বাহিরের নানা রাজসভায় গৌরববৃদ্ধি করেন। সুমাত্রার শৈলেন্দ্রবংশের রাজাদের কুলগুরু ছিলেন বাঙ্গালী পণ্ডিত কুমার ঘোষ। তিব্বতের রাজার অনুরোধে বাঙালী পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্মের সংস্কারের জন্য তিব্বতে যান।

বিভিন্ন বিষয়ে বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্য ঃ এইসময় বাঙালী চক্রপানী দত্ত, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ওপর একখানা বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন। সন্ধ্যাকর নন্দী নিজে এক বিখ্যাত কবি ও জীবনী লেখক ছিলেন। এইভাবে নানা বিষয়ে বাঙ্গালীর পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটে।

বাঙ্গলা ভাষার সূত্রপাত ঃ এই সময় বাঙ্গলা ভাষা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে আরম্ভ করে। এই সময় অনেক বৌদ্ধ "চর্যাপদ" রচিত হয়। এগুলিকে বাঙ্গলা ভাষার প্রথম রচনা ধরা হয়। সেন রাজাদের রাজত্বকালে জয়দেব তাঁর পদাবলী গ্রন্থ, 'গীতগোবিন্দ' লেখেন। জয়দেবের এই গ্রন্থ বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

ঘর বাড়ী তৈরী (স্থাপত্য) ও মূর্তি গড়ার কৌশলে (ভাস্কর্য) বাঙ্গালীর প্রতিভার প্রকাশ ঃ ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব বিবরণ পাওয়া যায় যে এগুলি তৈরী করতে খুব উঁচু স্তরের স্থাপত্য রীতি অনুসরণ করা হয়। পাল যুগের তৈরী কয়েকটি মূর্তি আছে। তা থেকে আমরা বলতে পারি ঐ সময় বাঙ্গালী ভাস্কর খুব ভাস্কর্য রীতি অনুসরণ করতেন।

বিদেশে বাঙ্গালী সংস্কৃতের প্রসার ঃ পালযুগে বাঙ্গলা দেশের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হয়।

সেন রাজাদের রাজত্বকালে সমাজের পরিবর্তন ঃ বৈদিক যুগে সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চার শ্রেণীর লোক ছিল ; কিন্তু বর্তমানে বাঙ্গালী সমাজে ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর তিন শ্রেণীর লোক দেখতে পাওয়া যায় না। এর কারণ, সমাজে বর্ণের পরিবর্তে পেশা

হিসাবে জাতির সৃষ্টি হয়। যেমন, কাপড় বোনা যাদের পেশা তাঁরা হলেন তাঁতী, চিকিৎসা করা যাঁদের জীবিকা তাঁরা হলেন বৈদ্য ইত্যাদি। সেন রাজারা এই জাতি বিভাগের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করেন— কোন্ পেশার লোক সমাজে কোন্ জাতি হিসাবে গণ্য হবে ও কোন্ জাতির লোকের সমাজে কোথায় স্থান হবে তা নির্দিষ্ট করে দিতে সেন রাজারা চেষ্টা করেন।

কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি : তোমরা হয়ত জান যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের কুলীন দাবী করেন। সেন রাজাদের রাজত্বকালে বাঙ্গালী সমাজে কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি হয়। কুলীনরা সমাজে অন্যদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা দাবী করত। তাঁরা নিজেদের মেয়েদের অকুলীনের ঘরে বিয়ে দিতে চাইতেন না। কুলীন ছেলে বেশী না পাওয়ার দরুণ সমাজে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে পণ দিয়ে কুলীনের ঘরে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু হয়। তারপর একজন কুলীনের ছেলে টাকার লোভে অনেকগুলি করে বিয়ে করতে আরম্ভ করেন। এভাবে সমাজে দুটি খারাপ প্রথা চালু হয়। এর মধ্যে পণ-প্রথা এখনও আমাদের সমাজে রয়ে গেছে।

তিনশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা : পালদের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে তিনটি রাজশক্তি প্রধান হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে প্রতিহার ও পালদের কথা তোমরা পড়েছ। তৃতীয় শক্তি হল দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশ। এ তিনটি রাজবংশই ভারত জুড়ে সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কেউই প্রাধান্য লাভ করেননি—ভারতবর্ষ জুড়ে স্থায়ী সাম্রাজ্যও আর গড়ে ওঠেনি।

উত্তর ভারতে রাষ্ট্রকূট বংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা : রাষ্ট্রকূট বংশের রাজারাই সর্বপ্রথম দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব উত্তর ভারত আক্রমণ করে প্রতিহার-রাজা ও পাল-রাজা উভয়কেই পরাজিত করেন। কিন্তু ধ্রুব দক্ষিণ ভারতে ফিরে গেলে উত্তর ভারতে তাঁর প্রাধান্য নষ্ট হয়ে যায়। পরে রাষ্ট্রকূট রাজা তৃতীয় গোবিন্দ আবার উত্তর ভারত আক্রমণ করেন। প্রতিহার ও পাল রাজা উভয়ই তাঁর কাছে পরাজিত হন। কিন্তু উত্তর ভারতে তাঁর প্রভাব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি।

ভারতের ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্তি : "তিনশক্তি"র মধ্যে যুদ্ধ

বিগ্রহের ফল হল, ভারতবর্ষ আবার ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দলের দলপতিরা ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। রাজপুতনা ও মধ্যভারতে এ ধরনের রাজ্য বেশী করে গড়ে ওঠে।

রাজপুত জাতির সৃষ্টি ঃ এসব ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা বেশীর ভাগই ছিলেন রাজপুত জাতির লোক। রাজপুতেরা নিজেদের বেদের সময়কার ক্ষত্রিয়দের বংশধর বলে মনে করেন। কিন্তু অনেকে মনে করেন যে হূণ, প্রতিহার প্রভৃতি যেসব বিদেশী জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এদেশে বসবাস করতে থাকেন তাঁরাই দেশের লোকেদের সঙ্গে মিশে গিয়ে রাজপুত জাতির সৃষ্টি করেন। রাজপুতরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত। অন্ততঃ ৩৬টি রাজপুত গোষ্ঠী ছিল। তাঁদের মধ্যে আবার বিবাদ-বিসম্বাদ প্রায়ই লেগে থাকত।

প্রধান রাজপুত গোষ্ঠী ঃ উত্তর ভারতে যেসব রাজপুত রাজারা রাজত্ব করতেন, তাঁরা প্রধানতঃ প্রতিহার, চৌহান, চালুক্য ও পারমার গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন।

রাজপুত চরিত্র ঃ রাজপুতদের চরিত্র কিছুটা ইউরোপের নাইটদের মত ছিল। তাঁরাও জীবনে উঁচু আদর্শ অনুসরণ করে চলতেন। রাজপুতদের দেশপ্রেমের কথা ভেবে আজও আমরা গৌরববোধ করি। তাঁরা বীর ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন। শত্রুদের প্রতি তাঁরা অন্যায় আচরণ করতেন না।

রাজপুতদের জৌহর ব্রত ঃ শত্রুর কাছে হেরে গেলে অনেক সময় জৌহর ব্রত করতেন। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে সকল বয়স্ক পুরুষ প্রাণ দিতেন। আর মেয়েরা তখন আগুন জ্বালাতেন। জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করে তাঁরা আত্মাহুতি দিতেন।

উত্তর করে শেখো

১। বামদিকের নাম, শব্দ বা বাক্যাংশের সঙ্গে ডানদিকের যে বাক্যাংশের সম্বন্ধ রয়েছে, তা বোঝানোর জন্য বামদিকের লেখা নাম, শব্দ বা বাক্যাংশের বামদিকের সংখ্যা, ডানদিকের বাক্যাংশের ডানদিকের বন্ধনীর ভেতর লেখ। এক বন্ধনীর ভেতর একাধিক সংখ্যা বসতে পারে। পরের পৃষ্ঠায় দেখ।

১। পাল বংশ ২। সেন বংশ ৩। রাষ্ট্রকূট বংশ ৪। ত্রিশক্তির দ্বন্দ্ব ৫। রাজপুতদের চরিত্র ৬। প্রধান রাজপুত গোষ্ঠী ৭। বিক্রম শিলা ৮। ওদন্তপুরী ৯। সোমপুরী ১০। শশাঙ্ক ১১। প্রতিহার বংশ।

ধ্রুব ( ) ছোট রাজ্যের সৃষ্টি ( ) অতীশ দীপঙ্কর ( ) ছয়টি মহাবিদ্যালয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ( ) মুসলমানদের বাঙ্গলাদেশ দখল ( ) উত্তর ভারত দুইবার আক্রমণ ( ) কর্ণসুবর্ণ ( ) দেশের লোক মিলিত হয়ে রাজা নির্বাচন ( ) ধর্মপাল ও দেবপাল ( ) তৃতীয় গোবিন্দ ( ) ভারতে বড় সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ ( ) ভোজ ( ) দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত রাজ্যের সীমানা ( ) সুলেমান ( )

২। পাল যুগে বাঙ্গালীর জ্ঞাননিষ্ঠা নাম দিয়ে একটি রচনা লেখ।
৩। ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্ব সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৪। রাজপুত জাতি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

পঞ্চচত্বারিংশ পাঠ
দক্ষিণ ভারতের কথা

রাষ্ট্রকূট বংশ : দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূট বংশের রাজা ধ্রুব ও তৃতীয় গোবিন্দ যে উত্তর ভারতের কিছু অংশ জয় করে, কিছুদিন তা নিজেদের অধীনে রাখতে সক্ষম হন সে কথা তোমাদের আগেই বলা হয়েছে।

গোদাবরী নদী ও তার চার পাশের জায়গা নিয়ে রাষ্ট্রকূট রাজ্য গড়ে উঠে।

এই বংশের আর একজন বড় রাজার নাম অমোঘবর্ষ। আরব পর্যটক সুলেমান তাঁর রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসেন। তিনি অমোঘবর্ষকে তখনকার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন রাজার মধ্যে একজন বলে বর্ণনা করে গেছেন।

চালুক্য বংশ : রাষ্ট্রকূট রাজ্যের পতনের পর চালুক্য বংশ দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য লাভ করেন। চালুক্য বংশ দুই জায়গায় রাজ্য গড়ে তোলে—বর্তমান কাঁথিওয়াড়ে একটি। কাঁথিওয়াড়ের বংশকে কল্যানীর চালুক্য বংশ ও বিজাপুরের বংশকে বাতাপির চালুক্য বংশ বলা হয়।

বাতাপির চালুক্য বংশ : দুই বংশের মধ্যে বাতাপির চালুক্য বংশই বেশী প্রাধান্য লাভ করে। দ্বিতীয় পুলকেশী এই বংশের নাম করা রাজা ছিলেন। হিউয়েন সাং তাঁকে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে বর্ণনা করে গেছেন। হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করে তিনি তাঁর দক্ষিণ ভারতে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর চেষ্টা ছিল সারা দক্ষিণ ভারত নিয়ে এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। তাই তিনি একেবারে দক্ষিণ প্রান্তের চের, চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য জয় করেন। উত্তর ভারতেরও কিছু কিছু জায়গা দ্বিতীয় পুলকেশী জয় করেন। কিন্তু তাঁর সাম্রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি।

পল্লব বংশ : পল্লবেরা দক্ষিণ ভারতের আর একটি শক্তিশালী রাজবংশ। কাঞ্চী ছিল তাঁদের রাজধানী। চালুক্যদের সঙ্গে পল্লবদের পুরুষানুক্রমে বিবাদ ছিল। এ বিবাদে কখনও চালুক্যেরা আবার কখনওবা পল্লবেরা জয়ী হতেন। পল্লব বংশের রাজা নরসিংহ বর্মা খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সারা সক্ষিণ ভারতে পল্লবদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। পল্লব রাজ্যের লোক চাষের কাজে খুব দক্ষ ছিল।

চোল রাজ্য : ভারতবর্ষের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে ছিল তিনটি রাজ্য চোল, চের ও পাণ্ড্য। এ রাজ্যগুলির মধ্যে চোল রাজ্যই প্রধান হয়ে উঠে। চোল রাজাদের মধ্যে কারিকাল, রাজরাজ ও রাজেন্দ্র চোল-এর নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়।

চোলদের নৌ-শক্তি : চোলেরা নৌ-শক্তিতে প্রবল হয়ে উঠে। দক্ষিণ ভারত মহাসাগরে তারা প্রাধান্য বিস্তার করে। জলপথে বাণিজ্যেও তারা অগ্রণী ছিল। চোল রাজা কারিকাল সিংহল জয় করেন। সিংহল থেকে তিনি শ্রমিক নিয়ে এসে নতুন রাজধানী ও একটি বাঁধ তৈরী করেন। রাজেন্দ্র চোলের নৌ-সেনাপতি আন্দামান নিকোবর ও মালয়ের কোন কোন অংশ জয় করেন।

দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির বিকাশ : উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতা বিকাশের ধারা মোটামুটি একই ধরণের। উত্তর ভারতের মত দক্ষিণ ভারতও কয়েকটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে কোন কোন রাজা কিছু সময়ের জন্য বেশ বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন তখনই তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য, কলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিকাশ ঘটে।

সাহিত্য ঃ রাষ্ট্রকুট, চালুক্য ও পল্লবদের রাজত্বকালে সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষ উন্নতি করে। সংস্কৃত সাহিত্যে ও জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে



কৈলাসনাথের মন্দির

অনেক বই লেখা হয়। দক্ষিণ ভারতে গণিত, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচিত হয়। দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃত কবি ভারবীর নাম বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়।

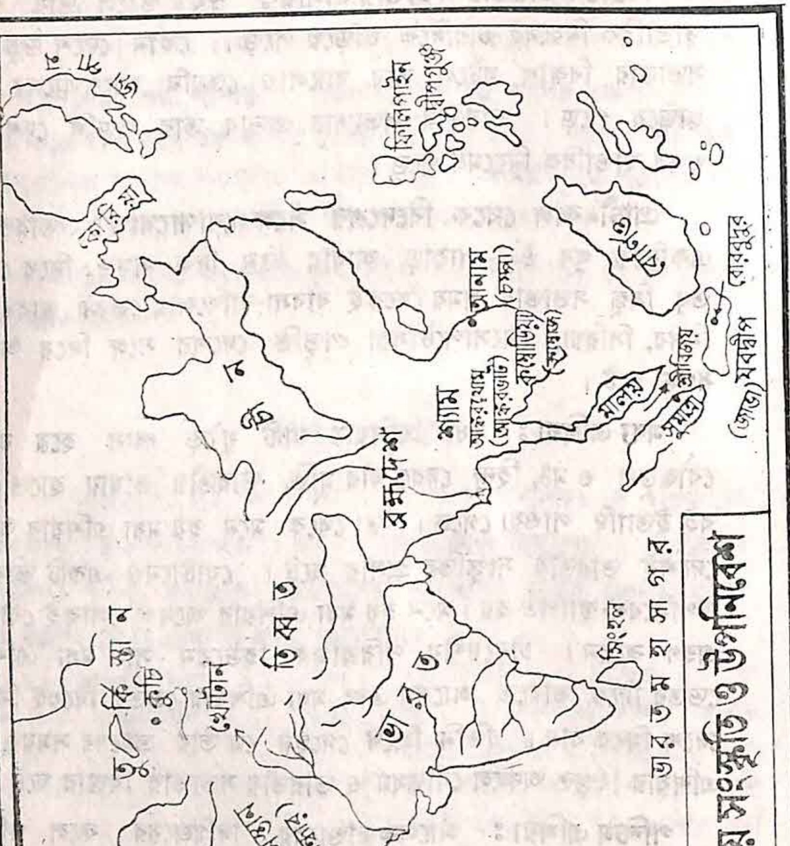


মামল্লপুরমের রথমন্দির

কলা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির ঃ রাষ্ট্রকুটদের রাজত্বকালে ইলোরার পাহাড় কেটে কৈলাসনাথের মন্দির

চীনদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম, জাপান ও কোরিয়ায় প্রসারিত হয়।

তিব্বত ঃ বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের অন্তরঙ্গ



যোগাযোগ স্থাপিত হয়। বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দীপঙ্কর অতীশ যে ধর্মপ্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন তা তোমরা জান। এছাড়া আরও অনেক ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতে যান।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঃ স্থলপথ ছাড়া জলপথেও ভারতবর্ষ তার দক্ষিণ-পূর্বের দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালি, বোর্ণিও প্রভৃতি জায়গায় ভারতীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন করেন। ঐসব অঞ্চলকে ভারতবর্ষে "সুবর্ণভূমি" বলা হত। অনেক ভারতীয় রাজকুমারের নিজের রাজ্য হারিয়ে "সুবর্ণভূমিতে" ভাগ্যান্বেষণে যাওয়ার প্রাচীন গল্প আছে। খ্রীষ্টের জন্মের একশ' বছর পর থেকে অনেক ভারতীয় নামধারী রাজা ঐসব অঞ্চলে রাজত্ব করতেন—হয়তবা তাঁরা ভারতীয় ছিলেন।

চম্পা রাজ্য ঃ বর্তমান ভিয়েতনাম দেশটি নিয়ে প্রাচীনকালে চম্পা রাজ্য স্থাপিত হয়। প্রাচীনগল্প থেকে জানা যায় একদল ভারতীয় বণিক চম্পায় রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের বেশ কয়েকজন রাজার ভারতীয় নাম ছিল। এই রাজ্যে কয়েকটি বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এগুলি ভারতীয় শিল্পরীতি অনুসারে তৈরী হয়েছিল।

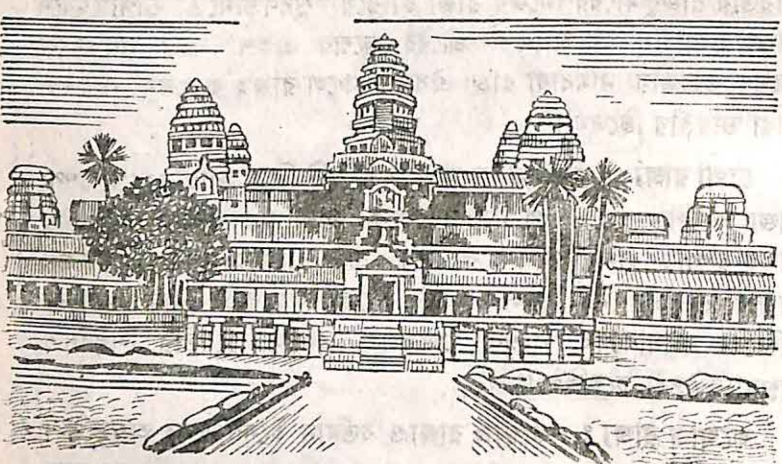
কম্বোজ রাজ্য ঃ কম্বোজ রাজ্যও বর্তমান ইন্দোচীনের অন্তর্ভুক্ত। একজন ভারতীয় রাজা কম্বু স্বয়ম্ভর এরাজ্য স্থাপন করেছিলেন বলে গল্প আছে। তাঁর নাম থেকেই এ রাজ্যের নাম হয় কম্বোজ। একজন চীন দেশীয় ঐতিহাসিক লিখে গেছেন যে একহাজার ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ থেকে এসে কম্বোজে বসবাস করতে থাকেন।

অঙ্কোরভাটের মন্দির ঃ কম্বোজ রাজ্যের অঙ্কোরভাটের মন্দির আজও বর্তমান রয়েছে। এই মন্দিরে ভারতীয় দেবতা বিষ্ণুর পূজা হয়। এই মন্দির লম্বায় প্রায় এক মাইল ও প্রস্থে আধ মাইল। মাটি থেকে মন্দির প্রায় ১৪২ হাত উঁচু; মন্দিরের ধাপে ধাপে শিব, অর্জুন যম প্রভৃতির মূর্তি চমৎকার ভাবে ক্ষোদিত করা আছে। সূর্য বর্মন (১১১২-১১৬০ খ্রীঃ) এই মন্দির স্থাপন করেন। মন্দিরটি পৃথিবীর মধ্যে আকারে বৃহত্তম ও সৌন্দর্যে অনুপম। কম্বোজে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারের প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই মন্দির।

অঙ্কোরথোমের মন্দির ঃ অঙ্কোরথোম ছিল কম্বোজের রাজধানী। এখানেও এক বিশাল মন্দির আছে যা কম্বোজে ভারতীয় সভাতার বিস্তারের সাক্ষী দেয়।

মালয় উপদ্বীপ ও দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ঃ শৈলেন্দ্র বংশ মালয় উপদ্বীপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজবংশ। এই রাজবংশের

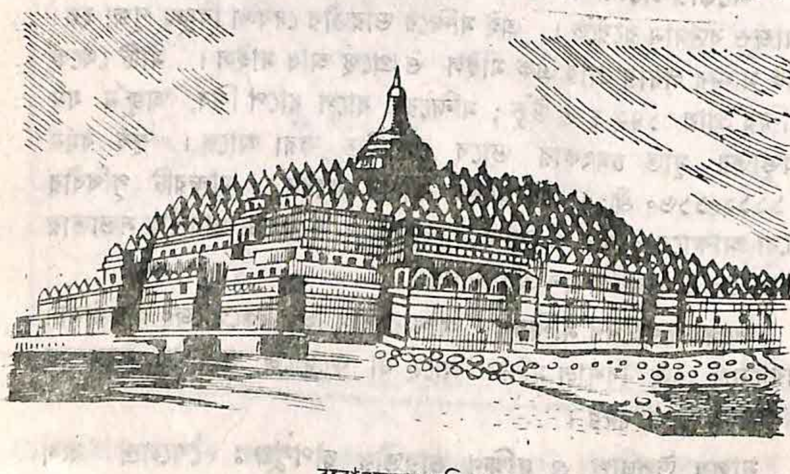
রাজারা সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালী, বোর্ণিও প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় সব কটি দ্বীপকেই তাঁদের অধিকারে আনেন। এই শৈলেন্দ্র বংশের রাজারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কুমার ঘোষ নামে একজন বাঙালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এ রাজবংশের গুরু ছিলেন। এ থেকে অনুমান করতে



অঙ্কোরভাটের মন্দির

পার যে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব শৈলেন্দ্র বংশের সাম্রাজ্যের ওপর ভালভাবেই পড়ে।

বরোবদূরের মন্দির ঃ যবদ্বীপ শৈলেন্দ্র বংশের রাজাদের অধীনে



বরোবদূরের মন্দির

আসার আগেই সেখানে এক ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়।

শৈলেন্দ্র রাজাদের অধীনে আসার পর, তাঁদের মাধ্যমে যবদ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার আরও বেশীভাবে ঘটে। শৈলেন্দ্র রাজাদের শাসনকালে ভারতীয় মূর্তি গড়ার ও ঘর বাড়ী তৈরী করার কৌশলের অনুকরণে যবদ্বীপে বিশ্ববিখ্যাত বরোবদূরের মন্দির তৈরী হয়। এই মন্দির পর পর ছয়টি স্তরে নির্মিত। এর ভিত্তি ১৩১ গজ এবং উচ্চতা ৬০ গজ। বরোবদুর মন্দিরের শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ বৌদ্ধ তারা দেবী। এখানে ধ্যানী বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে। বরোবদূরের শিলালিপির অক্ষরগুলি ভারতীয়।

ব্রহ্মদেশ ও সিংহল: ব্রহ্মদেশেও ভারতীয়েরা কিছু কিছু উপনিবেশ স্থাপন করেন। গল্প আছে যে বাঙালী বিজয় সিংহ সিংহল দ্বীপ জয় করে দ্বীপের নাম দেন 'সিংহল'। অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সিংহলে দূত পাঠান।

এইভাবে ভারতের পড়শী দেশগুলির ওপর ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব পড়ে।

উত্তর করে শেখো

১। নীচের দেশগুলিতে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্বন্ধে যা জান লেখ।
(ক) মধ্য-এশিয়া (খ) চীন-জাপান ও কোরিয়া (গ) তিব্বত (ঘ) দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া (ঙ) চম্পা (চ) কম্বোজ (ছ) মালয় উপদ্বীপ ও দক্ষিণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (জ) ব্রহ্মদেশ ও সিংহল।

২। ম্যাপে ভারতীয় সভ্যতার প্রসারের স্থানগুলি চিহ্নিত কর।

৩। অঙ্কোরথোম ও বরোবদূরের মন্দির সম্বন্ধে যা জান লেখ।

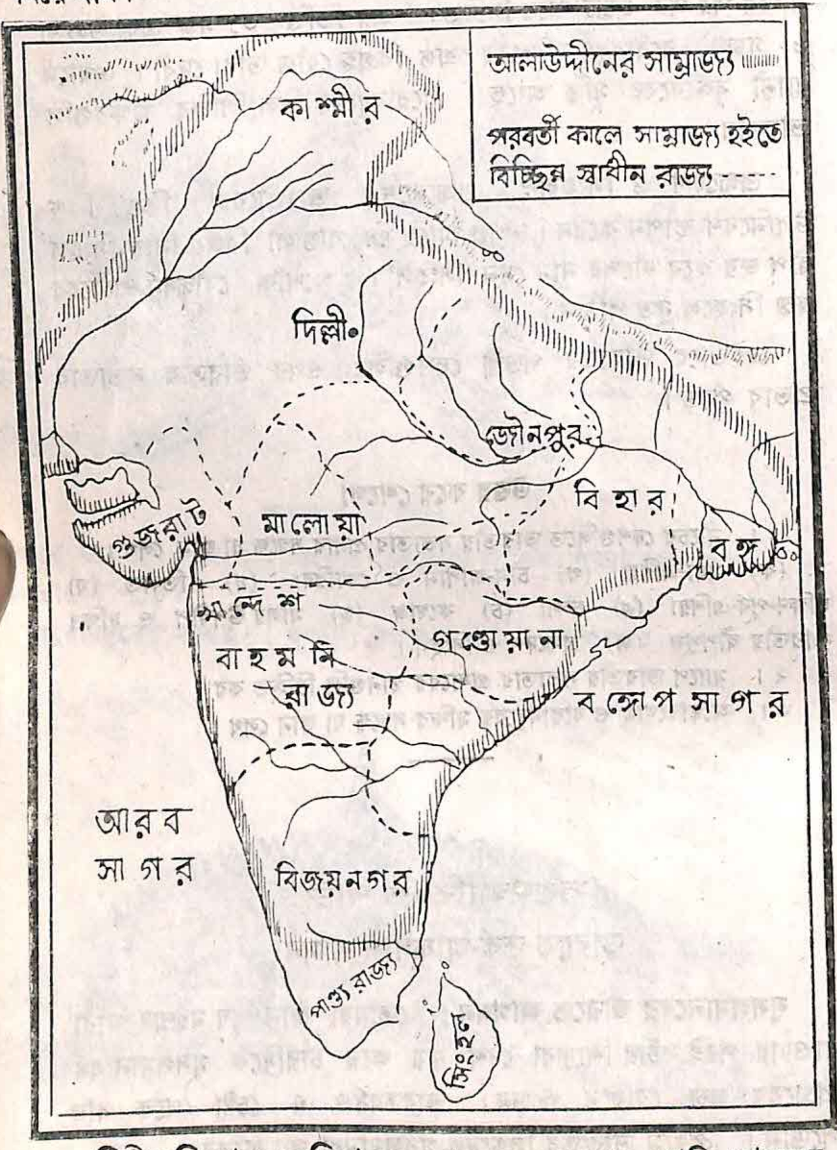
সপ্তচত্বারিংশ পাঠ

ভারতে তুর্ক-আফগান শাসন

মুসলমানদের ভারতে আগমন: তোমরা জান যে মহম্মদ মারা যাওয়ার পরই তাঁর শিষ্যেরা দেশ জয় করে চারদিকে মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য বেরিয়ে পড়েন। ভারতবর্ষও এ চেষ্টা থেকে বাদ পড়েনি। প্রথমে ভারতের সিন্ধুদেশ মুসলমানরা জয় করেন।

মামুদের বার বার ভারত আক্রমণ: এরপর বলতে হয়, ভারতের

উত্তর-পশ্চিমের মুসলমান রাজ্য গজনীর সুলতান মামুদের বার বার ভারত আক্রমণের কথা। অনেকে মনে করেন তিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। লুণ্ঠন করে প্রতিবারই বহু ধনরত্ন নিজের দেশে নিয়ে যান।



দিল্লীর সিংহাসন অধিকার : ভারতের ধনরত্নের খ্যাতি ভারতের ওপর মুসলমান আক্রমণ ডেকে আনে। ভারতবর্ষ তখন অনেকগুলি

ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রধানতঃ রাজপুত রাজারা শাসন করতেন। কিন্তু তাঁদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। এই সুযোগ নিয়ে ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে কাবুল ও গজনীর শাসনকর্তা মহম্মদ ঘুরী দিল্লী ও আজমীরের রাজা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন। পরে মহম্মদ ঘুরী কুতুবউদ্দিন নামে এক ক্রীতদাসকে দিল্লীর শাসনকর্তা নিযুক্ত করে গজনা ফিরে যায়।

দাস বংশের রাজত্বঃ মহম্মদ ঘুরী মারা গেলে কুতুবউদ্দিন সুলতান উপাধি নিয়ে দিল্লীতে স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন। কুতুবউদ্দিনের স্থাপিত সুলতান বংশকে দাসবংশ বলা হয়। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশের সবশুদ্ধ সাতজন সুলতান রাজত্ব করেন।

খলজী বংশঃ ভারতবর্ষে আগত মুসলমানদের মধ্যে দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া বিবাদ, ষড়যন্ত্র লেগেই থাকত। ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে দাসবংশের শেষ সুলতানকে হত্যা করে খলজীবংশ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।


আলাউদ্দিন খলজী

আলাউদ্দীন খলজীঃ এই বংশের সবচাইতে পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন আলাউদ্দীন খলজী। সম্রাট হয়ে তিনি একে একে গুজরাট রাজপুতনা ও মালব অধিকার করেন। কাশ্মীর উড়িষ্যা ও আসাম ব্যতীত সমস্ত আর্যাবর্ত তাঁর করায়ত্ত হয়। তাঁর সুদক্ষ সেনাপতি মালিক কাফুর চারবার দাক্ষিণাত্য অভিযান করে দেবগিরি, বরঙ্গল, দোরসমুদ্র ও মাদুরা জয় করেন।

মাত্র তিরিশ বছর রাজত্ব করার পর খলজী বংশের পতন হয় ও তুঘলক বংশের সুলতানেরা দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। এই বংশের সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলক একদিকে ছিলেন যেমন পণ্ডিত, প্রতিভাশালী কবি, নিষ্ঠাবান ও দানশীল অপরদিকে তেমনি ছিলেন

খামখেয়ালী। তাঁর সময়ে কিছু কিছু স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় ও কিছু কিছু মুসলমান শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

তৈমুর লঙ-এর দিল্লী লুণ্ঠন : তুঘলক বংশের শেষ সুলতানের শাসনকালে মধ্য এশিয়া থেকে এসে তৈমুর লঙ ভারত আক্রমণ করেন।



মহম্মদ-বিন-তুঘলক

তৈমুর লঙ পাঞ্জাব বিধ্বস্ত করে দিল্লী দখল করে তিনমাস অবাধে হত্যা ও লুণ্ঠন চালান। তাঁর মত নিষ্ঠুর লোক ইতিহাসে খুব কমই ছিল। তিনি অনেক ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরে যান।

সৈয়দ বংশ : তুঘলক বংশের পর, খুব অল্প দিনের জন্য সৈয়দ বংশ দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।

লোদী বংশ : তারপর লোদীবংশ দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। এই বংশের শেষ সুলতানকে পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত করে (১৫২৬ খ্রীঃ) বাবর দিল্লীতে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মধ্য এশিয়া থেকে দিল্লী জয় করেন।

তুর্কী-আফগান শাসন : ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩২০ বছর ধরে দাস, খলজী, তুঘলক, সৈয়দ ও লোদী এই পাঁচটি সুলতান বংশ ভারতবর্ষ শাসন করেন। এদের মধ্যে প্রথম চারটি

বংশের সুলতানেরা জাতিতে তুর্কী ছিলেন আর লোদী বংশের মুসমানরা আফগান ছিলেন। তাই এই ৩২০ বছরের রাজত্বকালকে তুর্কী আফগান রাজত্বকাল বলা হয়।

উত্তর করে লেখো

১। বাম দিকের যে নামের সঙ্গে ডান দিকের যে বাক্যাংশের সম্বন্ধে রয়েছে তা বোঝানোর জন্য, বাম দিকের নামের বাম দিকের সংখ্যা, ডান দিকের বাক্যাংশের ডান দিকের বন্ধনীর ভেতর লেখ। এক বন্ধনীতে একাধিক সংখ্যা লিখতে পার।

১। সুলতান মামুদ ২। মহম্মদ ঘুরী ৩। কুতুবুদ্দিন ৪। আলাউদ্দিন ৫। মহম্মদ বিন্ তুঘলক ৬। তৈমুর লঙ ৭। লোদী বংশ	১৭ বার ভারত আক্রমণ ( ) তিনমাস ধরে দিল্লীতে হত্যা ও লুণ্ঠন ( ) পণ্ডিত ও খামখেয়ালী সুলতান ( ) দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা ( ) পাণিপথের যুদ্ধ ( ) দক্ষিণ ভারত জয় ( )

২। ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে কেন ভারতে তুর্কী আফগান শাসন কাল বলা হয় ?

অষ্টচত্বারিংশ পাঠ

তূকী আফগান শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সভ্যতা

মুসলমানদের হিন্দু সমাজ থেকে আলাদা থাকা : আগে যেসব বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতবর্ষে এসে বসবাস করেন (হূণ, কুষাণ প্রভৃতি) তাঁরা সকলেই ভারতীয় সমাজে (হিন্দু) মিশে গিয়ে এক হয়ে যান। কিন্তু মুসলমানরা ভারতবর্ষ জয় করে আলাদাই রয়ে যায়। এর কারণ মুসলমানরা তাঁদের নিজস্ব ধর্ম ও সভ্যতা নিয়ে ভারতে আসেন। এমনকি নিজেদের ধর্ম প্রচার করা তাঁদের ভারতবর্ষ জয়ের একটা কারণ ছিল। তারপর মধ্য এশিয়া থেকে নতুন নতুন মুসলমান দল সব সময়ই ভারতবর্ষে আসেন।

হিন্দু-মুসলমানদের মিলন সূত্র ঃ আলাদা থাকতে চাইলে কি হবে, দীর্ঘদিন একসঙ্গে বাস করে, একসঙ্গে কাজ করে, পরস্পর পরস্পরের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে, হিন্দু, মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে না মিলে থাকতে পারেননি। তাছাড়া ভারতের মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই আগে হিন্দু ছিলেন। তাঁরা মুসলমান হয়েও তাঁদের আগের সমাজ—ভাই-বন্ধুকে ভুলতে পারেননি।

ধর্মের ভেতর দিয়ে মিলন ঃ ধর্মই হিন্দু ও মুসলমানকে আলাদা করে রাখে, আবার ধর্মের ভেতর দিয়েই তাঁদের মিলন সাধনের চেষ্টা করা হয়। এই সময় দক্ষিণ ও উত্তর ভারত দুই জায়গায় কয়েকজন ধর্ম প্রচারক জন্ম গ্রহণ করেন—যাঁদের এই চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয়।

ধর্মভক্তির প্রাধান্য ঃ এসব ধর্ম প্রচারকেরা, ধর্মের আচার, নিয়ম, বাধা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা বলতেন কেবলমাত্র ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমেই ভগবানকে পাওয়া যায়। তাঁরা প্রচার করতেন —ভগবানের কাছে মুচি, মেথর, হিন্দু, মুসলমান সবাই সমান।



কবীর

কবীর ঃ এসব ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে কবীর ছিলেন একজন। তিনি সামান্য তাঁতীর কাজ করতেন। লেখা-পড়া জানতেন না। শুধু ভগবানকে ভালবেসেই তিনি তাঁকে জেনে ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান দু-ধর্মের লোকই তাঁর শিষ্য ছিল। কবীর খুব সহজ ও সরল ভাষায় দু-লাইনের কবিতার ভেতর দিয়ে তাঁর ধর্মমত প্রচার করতেন। এই কবিতা-গুলোকে দোঁহা বলা হয়। আজও গ্রাম দেশে হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের লোকের মুখেই কবীরের দোঁহা শোনা যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব ঃ এ সময়কার শ্রীচৈতন্যদেবও ছিলেন ভক্তিমার্গের সাধক। তিনিও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা প্রচার করতেন। তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেও বাংলা দেশের বাইরে, উড়িষ্যা, দক্ষিণ-ভারত, কাশীধাম, বৃন্দাবন প্রভৃতি অনেক জায়গায় ধর্ম প্রচার

করেন। মানুষ ভগবানকে কত গভীরভাবে ভালবাসতে পারে তিনি তাঁর জীবনে দেখিয়ে যান। সবসময়ই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর থাকতেন তিনি। নিজে ব্রাহ্মণ হলেও জাতিভেদ প্রথা মানতেন না। সকল জাতির লোকই এমনকি মুসলমানও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। শ্রীচৈতন্যদেবের একজন প্রধান শিষ্য "যবন হরিদাস" মুসলমান ছিলেন। বর্তমানে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মের প্রচার ভারতবর্ষের বাইরেও হচ্ছে—ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছেন।


শ্রীচৈতন্যদেব

গুরু নানকঃ গুরু নানক ছিলেন এখানকার আর একজন ধর্ম প্রচারক। বর্তমান পাকিস্থানের লাহোরের কাছে এক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গুরু নানকের ধর্মের উঁচু নীচু ভেদাভেদ ছিল না। হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মের লোকই তাঁর শিষ্য। গুরু নানকের শিষ্যদের শিখ বলা হয়। শিখ শব্দের অর্থ শিষ্য। শিখধর্মে গুরুর স্থান সবার ওপরে। শিখেরা ভগবানকে ভালবেসে তাঁর জপ করার ওপর বিশেষ জোর দেন। তাঁরা লম্বা চুল ও দাড়ী রাখেন ও হাতে লোহার বালা পরেন।

উর্দু ভাষার সৃষ্টিঃ ধর্ম ছাড়া ভাষার ওপরেও হিন্দু ও মুসলমান দুই সভ্যতার মিলনের প্রভাব পড়ে। সুলতানেরা ভারতবর্ষে ফরাসী ভাষার প্রচলন করেন। ফরাসী ভাষার সঙ্গে হিন্দি ভাষা মিলে উর্দু ভাষার সৃষ্টি হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় উর্দ্দু ভাষায় কথা বলতে ও লিখতে আরম্ভ করেন। মুসলমান কবি আমীর খসরু উর্দ্দু ভাষায় অনেক কবিতা লিখে গেছেন। আজও ভারতের অনেক লোক উর্দ্দু ভাষাভাষী।

ভারতীয় ভাষার উন্নতি ও রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদঃ সুলতানদের রাজত্বকালে ভারতের জনসাধারণের ভাষার উন্নতি ঘটে। এই যুগের ধর্ম প্রচারকেরা তাঁদের ধর্মপ্রচারের জন্যে সংস্কৃত ব্যবহার করেন। ফলে হিন্দি ও বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ উন্নতি ঘটে।

তাছাড়া, মুসলমান শাসন কর্তাদের উৎসাহে রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত থেকে সাধারণ লোকের ভাষায়ও অনুবাদ করা হয়।

হিন্দু-মুসলমান মিলিত শিল্পরীতি ঃ মুসলমানেরা মসজিদ, মিনার, সমাধি মন্দির প্রভৃতি তৈরী করতে বরাবরই পটু ছিলেন। অবশ্য হিন্দুরাও মন্দির প্রভৃতি তৈরী করার কাজে খুব দক্ষ ছিলেন। সুলতানদের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমান শিল্পরীতির মিলন ঘটে। ফলে দেশের নানা জায়গায় নতুন নতুন রীতির অনেক মসজিদ প্রভৃতি তৈরী হয়। এদের অনেকগুলি আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে।

শাসন ব্যবস্থা ঃ সুলতানেরা তাঁদের রাজ্যকে প্রদেশে ভাগ করেন। দিল্লী ও তার কাছাকাছি জায়গাগুলি সুলতান সোজাসুজি শাসন করতেন। প্রদেশগুলির জন্য শাসন কর্তা নিয়োগ করা হত। সুলতান সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁর অধীনে বড় থেকে ছোট অনেক কর্মচারী থাকতেন। সকলেই সুলতানের আদেশ মেনে চলতেন। এখনকার মতই প্রদেশগুলির জেলা, গ্রাম প্রভৃতি ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত থাকত। প্রদেশের শাসন কর্তারা একটু শক্তিশালী হলেই সুলতানকে গ্রাহ্য করতেন না। ফলে ক্ষমতা নিয়ে ঝগড়াঝাটি ও ষড়যন্ত্র

তুর্কী-আফগান শাসনকালে, হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সভ্যতা ১৫৫

লেগেই থাকত। হিন্দুদের বিধর্মী বললেও, অনেক হিন্দুকে নিজেদের নিজেদের প্রয়োজনেই, মুসলমান শাসন কর্তারা রাজকর্মচারী রূপে নিয়োগ করতেন। হিসাব রাখার কাজে হিন্দুরা খুবই পারদর্শী ছিলেন।

অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ তখনকার দিনে অর্থশালী দেশ বলে ভারতের যে খ্যাতি ছিল তা' তোমাদের বলা হয়েছে। ভাল বৃষ্টি হলে চাষ ভাল হ'ত। নানা ধরনের কুটির শিল্পে ভারতীয়েরা পটু ছিল। বাণিজ্যেও তারা অগ্রণী ছিল। কিন্তু সাধারণ লোকের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। মুসলমান আমীর-ওমরাহরা বিলাসের জীবন কাটাতেন। অর্থশালী হিন্দুরাও তাঁদের অনুকরণ করতেন। কিন্তু সাধারণ লোককে কষ্টের জীবনই কাটাতে হ'ত। খরা ও অতিবৃষ্টির জন্য দেশে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হ'ত। দুর্ভিক্ষের সময় হাজার হাজার গরীবলোক না খেয়ে মারা যেত। ভাল চাষবাস হলে অবশ্য জিনিস-পত্রের দাম কম থাকত। কিন্তু অজন্মার বছর সব কিছুই অগ্নিমূল্য হয়ে উঠত। চাষবাসের উন্নতির দিকে খুব কম শাসনকর্তারই দৃষ্টি ছিল।

অর্থ নৈতিক জীবনে হিন্দুদের অসুবিধা ঃ অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে,

মুসলমান শাসনকর্তারা তাঁদের মুসলমান ও হিন্দু প্রজাদের আলদা চোখে দেখতেন। হিন্দুদের অনেক রকমের কর দিতে হ'ত, যা মুসলমানদের দিতে হ'ত না। এদের মধ্যে জিজিয়া কর প্রধান। ব্যবসার ক্ষেত্রেও হিন্দুদের মুসলমানদের চেয়ে অনেক বেশী শুল্ক দিতে হ'ত।

উত্তর করে শেখো

১। তুর্কী আফগান শাসন কালে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রধান মিলন-সূত্র কি ছিল?

২। এই সময় ধর্মের ভেতর দিয়ে যেসব মহাপুরুষ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মিলনের চেষ্টা করেছিলেন তাদের নাম কর। তাঁদের প্রত্যেকের ধর্ম সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। নীচের লেখা বিষয়গুলি সম্বন্ধে যা জান সংক্ষেপে লেখ—(ক) উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি (খ) ভারতীয় ভাষার উন্নতি (গ) হিন্দু-মুসলমান মিলিত শিল্পরীতি।

৪। তুর্কী আফগান শাসনকালে শাসনব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

ঊনপঞ্চাশৎ পাঠ

সুলতানী যুগে বাঙ্গলা

মুসলমানদের বাঙ্গলাদেশ জয়ঃ দাসবংশের প্রথম সুলতান কুতুবুদ্দিনের রাজত্বকালে, তাঁর সেনাপতি বক্তিয়ার খলজী বাঙ্গলার রাজা লক্ষ্মণসেনের কাছ থেকে নদীয়া জয় করে নেন। তারপর ধীরে ধীরে সমস্ত বাঙ্গলা দেশই মুসলমানদের অধীনে চলে আসে। নামে দিল্লী সুলতানের অধীনে থাকলেও বাঙ্গলার মুসলমান শাসনকর্তারা মোটামুটি স্বাধীনভাবেই দেশ শাসন করতেন।

শাসনকর্তা ইলিয়াস শাহঃ সুলতানী আমলে বাঙ্গলার শাসনকর্তাদের মধ্যে ইলিয়াস শাহের নাম বিশেষভাবে করতে হয়। তিনি নেপাল ও উড়িষ্যা জয় করে বাঙ্গলা দেশে অনেক ধনরত্ন নিয়ে আসেন। কামরূপ রাজ্যেরও কিছু কিছু অংশ তাঁর অধীনে আসে। ইলিয়াস শাহের রাজধানী ছিল পাণ্ডুয়ায়।

শাসনকর্তা হুসেন শাহঃ হুসেন শাহের শাসনকালও বাঙ্গলা দেশের আর একটি বিশেষ গৌরবের সময়। তিনি উত্তরে কুচবিহার ও দক্ষিণে উড়িষ্যা পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তার করতে সক্ষম হ'ন।

ইলিয়াস শাহ ও হুসেন শাহের সময় বাঙ্গলার সমাজ ও সভ্যতা : এই দুই শাসতকর্তার শাসনকালে বাঙ্গলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে নানাভাবে মিলন ঘটে। প্রথমেই বলতে হয় ধর্মের কথা। হুশেন শাহের রাজত্বকালেই শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে তাঁর ধর্মপ্রচার করতে আরম্ভ করেন। হুশেন শাহ শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচারে একটুও বাধা দেননি। শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মমতে যে হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ছিল না ও তাঁর যে মুসলমান শিষ্যও ছিল তা' তোমরা পড়েছ। হিন্দুরা মুসলমান পীরদের সম্মান করতে আরম্ভ করেন। অন্যদিকে হিন্দদের পূজিত সত্যনারায়ণকে মুসলমানেরা সত্যপীর নাম দিয়ে পূজো করতে আরম্ভ করেন।

হিন্দুদের উচ্চ রাজকার্যে নিয়োগ : এ সময় বাঙ্গলা দেশে হিন্দু মুসলমানের মিলন এতখানি সফল হয় যে মুসলমান শাসনকর্তারা অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতে আরম্ভ করেন।

বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি : হুশেন শাহ বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। হুশেন শাহের উৎসাহে বৈষ্ণবদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ শ্রীমৎভাগবত বাংলায় অনুবাদ করা হয়। এই সময়ই দেবী বিষহরির গল্প নিয়ে পদ্মপুরাণ বাংলা ভাষায় রচিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা অনুবাদও এসময় রচিত হয়।

মসজিদ, সমাধি ভবন নির্মাণ : বাঙ্গলার মুসলমান শাসকেরা সুন্দর সুন্দর মসজিদ, সমাধি ভবন ও তোরণ তৈরী করেন। এদের মধ্যে দাখিল দরওয়াজা, বড়সোনা মসজিদ্ ও আদিনা মসজিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

উত্তর করে শেখো

১। সুলতানী যুগে বাঙ্গলা দেশ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লেখ।

পঞ্চাশৎ পাঠ

অবসানের পথে মধ্যযুগ

অবসানের পথে মধ্যযুগ : মোটামুটি ভাবে ইউরোপে মধ্যযুগ আরম্ভ হয় পঞ্চম শতাব্দী ব খ্রীষ্টের জন্মের ৫০০ বছর পরে। প্রায় ১০০০ বছর চলার পর, অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীতে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ১৫০০ বছর পরে মধ্যযুগকে আমরা অবসানের পথে দেখতে পাই। এর অর্থ হল চতুর্দশ শতাব্দীতে আমরা দেখতে পাই যে মধ্যযুগে যে সব প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে (যেমন ফিউডাল প্রথা) তারা একে একে ভেঙ্গে পড়ে। ফলে জনসাধারণের জীবনের ওপর

তাদের প্রভাব কমে আসে। অপর দিকে বর্তমান যুগে যে সব প্রতিষ্ঠান আমাদের জীবনের ওপর বেশী করে প্রভাব বিস্তার করে (যেমন, বড় বড় কলকারখানা) তারা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। তাই চতুর্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা বলতে পারি এমন একটা সময় যখন মধ্যযুগ অবসানের পথে। নীচে এবিষয়ে আমরা কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ও "নবজন্ম আন্দোলন" : বারবেরিয়ানদের হাতে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা (গ্রীক ও রোমান) আশ্রয় নেয়, পূর্বরোমান সাম্রাজ্যে, বিশেষ করে তার রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী মুসলমানরা কনষ্টান্টিনোপল দখল করে নেয়। ফলে কনষ্টান্টিনোপলে প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক যে সব জ্ঞানী-গুণী লোক ছিলেন তাঁরা ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে পালিয়ে যান। সেখানে তাঁরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার আলো ছড়িয়ে দিতে থাকেন। ফলে ইউরোপের লোকেরা প্রাচীন সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। এভাবে হ'ল প্রাচীন সভ্যতার "নবজন্ম।" ইউরোপে প্রাচীন সভ্যতাকে নতুন করে ফিরিয়া আনার এ আন্দোলনকে বলা হয় "নবজন্ম" বা রেনেসাঁ আন্দোলন।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও নতুন জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি : নবজন্ম আন্দোলন প্রথমতঃ, মানুষের মনে জিজ্ঞাসা ও নতুন নতুন জ্ঞানলাভের আকাজ্ক্ষা সৃষ্টি করে। চার্চ ও লর্ডদের পদানত থেকে মধ্যযুগে ইউরোপের লোকেরা যা চলে আসছে তাই মেনে নিত। 'কেন মানবো' ?—এ প্রশ্ন তাদের মনে আসত না। "নবজন্ম" আন্দোলনের ফলে তাদের মনে জিজ্ঞাসা ও জ্ঞানলাভের আকাজ্ক্ষার সৃষ্টি হয়।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ও নতুন আবিষ্কার : সব জিনিস ভাবব, দেখব, জানব, এই আকাজ্ক্ষার সৃষ্টির ফলে বিজ্ঞানের দিকে মানুষের ঝোঁক বাড়ে। বিজ্ঞানের জ্ঞান যত বাড়তে থাকে তত মানুষ নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নতুন নতুন যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার করতে থাকে।

হাতে-নাতে দেখে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করা : বিজ্ঞানীদের নিয়মই হল, যে তাঁরা কোন কিছু অন্যের মুখের কথা শুনে মেনে নিতে পারেন না। সব কিছুই তাঁরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে দেখতে চান। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় দিয়ে যে সব জিনিস গ্রহণ করা যায়, যাদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান যায়—এগুলিই শুধু বিজ্ঞানীর কাছে গ্রহণযোগ্য।

ইউরোপের সভ্যতার প্রসার ঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বেড়ে যাওয়ার ফলে ইউরোপের লোকের নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করার সুযোগ আসে। বিজ্ঞান তাদের ভূগোলের জ্ঞান বাড়িয়ে দেয়। সমুদ্রে যাতায়াতের জন্য তারা দ্রুতগামী ও মজবুত জাহাজ তৈরী করে ও সমুদ্রে দিক নির্ণয়ের যন্ত্র আবিষ্কার করে। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে যাওয়ার সমুদ্রপথ আবিষ্কার করে। ফলে আমেরিকা প্রভৃতি দেশ আবিষ্কৃত হয়। ঐসব দেশে ইউরোপের সভ্যতার প্রসার ঘটে।

জাতীয় রাষ্ট্র গঠন ঃ মধ্যযুগের অবসানের আর একটি লক্ষণ হল ইউরোপের প্রত্যেক দেশেরই জাতীয় ভাষার সৃষ্টি। মধ্যযুগের মত ল্যাটিন ও গ্রীস আর সারা ইউরোপের ভাষা রইল না। ফ্রান্সের লোক ফরাসীকে, ইংলণ্ডের লোক ইংরেজীকে, জার্মানীর লোক জার্মানকে, এইভাবে প্রত্যেক দেশের লোকই জাতীয় ভাষাকে নিজের রাষ্ট্রের ভাষা বলে গ্রহণ করে।

এর আর একটা ফল হল মধ্যযুগের পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের মত বিশাল সাম্রাজ্য আর ইউরোপে রইল না। প্রত্যেক ভাষাভাষী লোক তাদের নিজেদের আলাদা স্বাধীন ও সর্বক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্র গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের জন্য অবশ্য সব জাতিকেই অল্প বিস্তর সংগ্রাম করতে হয়। সংগ্রামে কিন্তু জাতীয় রাষ্ট্রগুলিরই জয় সূচিত হয়।

নতুন ও পুরাতন দ্বন্দ্ব ঃ পুরাতন সহজে বিদায় নিতে চায় না। সে মানুষের মনে শিকড় গেড়ে বসে। জাতীয় রাষ্ট্রের রাজাগণ রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটদের অনুকরণে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান। অথচ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার ফলে দেশের মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হতে আরম্ভ করে। আগের দিকে বিজ্ঞানের জগতের মানুষ খ্রীষ্টান ধর্মের অনেক অহেতুক কথাকে অস্বীকার করতে আরম্ভ করে। তারা ধর্মের সংস্কার দাবী করে। নতুন যুগের সুরুতে, বিশেষ করে এই দুই ক্ষেত্রে পুরাতন যুগের সঙ্গে দ্বন্দ্ব দেখতে পাই।

নতুন যুগে প্রবেশ ঃ মোটকথা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকের ইতিহাস পড়লেই বোঝা যায় যে মানুষ এক নতুন যুগে প্রবেশ করতে চলেছে।

উত্তর করে শেখো

১। অবসানের পথে মধ্যযুগ বলতে আমরা কি বুঝি, ব্যাখ্যা কর।
২। কন্সটান্টিনোপলের পতনের ফল কি হয়েছিল ?
৩। "নবজন্ম আন্দোলন" কাকে বলে ব্যাখ্যা কর।
৪। নবজন্ম আন্দোলনের ফলাফল কি হয়েছিল ব্যাখ্যা কর।